মনোমুকুর

সমরেশ বসু

ক্লাসিক প্রেস

প্রথম প্রকাশ
অগ্রহায়ণ, ১৩৬৫

দ্বিতীয় মুদ্রণ
জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৬

প্রকাশক
নারায়ণ সেনগুপ্ত
৩।১এ, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—১২

প্রচ্ছদ রূপায়ণ
গনেশ বসু

মুদ্রাকর
শ্রীইন্দ্রজিৎ পোদ্দার
শ্রীগোপাল প্রেস
১২১, রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—৪

মূল্য আড়াই টাকা

মা কে

লেখকের অন্যান্য বই

গ ঙ্গা

ত্রি ধা রা

ভা নু ম তী

স ও দা গ র

তৃষ্ণা, ষষ্টঋতু, পশারিণী

শ্রীমতীকাফে, বি. টি রোডের ধারে, ইত্যাদি

গল্পক্রম

আরোগ্য, মহাযুদ্ধের পর, ছেঁড়া তমসুক, শোভাবাজারের শাইলক, অবাধ্য, শেষ হাসি, মান, একটু নীল আকাশের খোঁজে।

দেয়ালে আয়না টাঙানো থাকে। লোকে মুখ ছ্যাখে, নিজের মূর্তি ছ্যাখে। অপরের সামনে কাজসারা দেখাদেখি করে। নির্জনে ছ্যাখে মন ভরে। নানা রকমে ছ্যাখে। দেখে হাসে, রাগে, কাঁদেও বুঝিবা! তবু দেখতে ভাল লাগে। অপরের চোখে যা-ই হোক, আয়নার প্রতিবিম্ব তার ছায়া। তার রূপ। মানুষ যাকে সবচেয়ে বেশী ভালবাসে।

—কিন্তু অপরূপ? তাকে তো পারা-লাগানো কাচের বুকে দেখা যায় না! তাকে বোধহয় শুধু অনুভবই করা যায়। সেই অনুভবের প্রকাশই যেন যত শিল্প-কলা। বাউল তার গানে বলেছে, 'আরশী-নগরের' কথা, যে-নগরে অপরূপের দর্শন হয়। আরো গেয়েছে—'মন আছে তোর মনের ভিতরে।'

সে মনের ছায়া যে আরশীনগরে পড়ে, সে-নগরেরই এক দিক যেন গল্প ও কাহিনী।

তাই এ বইয়ের নাম 'মনোমুকুর' গল্পের নামে যার সন্ধান মিলবে না।

আরোগ্য

নটীর-হাটের এই স্টেশনের সামনেটিতে দাঁড়িয়ে থাকি রোজ। সকালে-দুপুরে-বিকেলে-সন্ধ্যায়-রাত্রে-মধ্যরাত্রে। কখনো সজ্ঞানে আসি, কখনো নিশির টানে। না এসে পারিনে।

নটীর-হাট যেন এক অদৃশ্য পাঁচিলে ঘেরা, ছন্নছাড়া কোন এক আদ্যিকালের নগরী। সবই তার পুরণো, প্রায় প্রাচীনের পর্যায়ে গিয়ে পড়ে। বাড়িঘর, রাস্তাঘাট, তাবত বাসাড়ে-বাসিন্দে-অধিবাসী, মন্দির-বিগ্রহ-ধর্মশালা, সবই। নতুন উঠেছে যেগুলি, সেগুলি যেন পুরণো ছেঁড়া ধুলোমাখা কাগজের স্তূপে কয়েকখণ্ড নতুন কাগজ। চোখে পড়েও পড়ে না। বাস্তু পুরুতের গলিটি এখনো আছে ঠিক তেমনি। আছে তার শেওলা-ধরা, বেঁটে-খাটো নিচু একতলা দোতলা বাড়িগুলি, এবড়ো খেবড়ো রাস্তাটি, খোপে খোপে বংশ পরম্পরায় সেই শালিকেরা, আর সেই একই গোত্রের মেয়েরা, যাদের চেহারা ও নাম বদলায় প্রায়ই, দলে দলে যায় আর আসে। কিন্তু সন্ধ্যাকালে সবাই রং মাখে, সাজে, এসে দাঁড়ায় রাস্তার দরজায়। নটীর-হাটের একেলে পৌরকর্তারা রাস্তাটির নাম করে দিয়েছেন 'সাহিত্য-সম্রাট-ভ্রাতা রোড'। কেমন একটু কানে লাগে খট করে। কে সেই সাহিত্য-সম্রাট, কে তার ভ্রাতা কে জানে। ভ্রাতার নাম না থাকাটাও বড় বিচিত্র, কিন্তু এইটিই বিশেষত্ব নটীর-হাটের। কেননা, ও নামে ত কিছুই যায় আসে না, রাস্তাটা যে নটীর হাটের মজ্জায় মজ্জায় বাস্তু পুরুতেরই গলি। আর ঠিক এমনি গলি এত আছে নটীর-হাটের এই সোয়া বর্গমাইলের চৌহদ্দিতে…যাক্‌, প্রসঙ্গান্তরে চলে যাচ্ছি।

বছর ষাটেক আগেও পশ্চিমে গঙ্গাই ছিল নটীর-হাটের সদর দেউড়ি। এখন এই স্টেশন। পুরনো সদর এখন খিড়কি-দোর। যত রাজ্যের যাওয়া আসা এখানে। শুধু শহর নয়, মনে হয়, স্টেশনের এখানটা যেন সেই অলক্ষিত পাঁচিল-ঘেরা নটীর-হাটের সুউচ্চ সর্বোচ্চ চিলে-কোঠাখানি। এখান থেকেই দেখা যায় নটীর-হাটের সব অন্দর ও অন্ধকারের ঘটনা, শোনা যায় স্পষ্ট অস্ফুট সব কলকাকলি।

এই চিলে-কোঠাখানি আমার খেলাঘর। এর অগুনতি ঘুলঘুলিতে আমি সকৌতুক অস্থির চোখ নিয়ে ছুটে বেড়াই। তার মধ্যে একটি ভুল সম্প্রতি ধরা পড়েছে। আমি অনুভব করেছি, এ শুধু আমার খেলাঘর নয়, আমার যত শিক্ষা গোড়া বাঁধার এটি একটি স্কুলও বটে।

জন্ম-মৃত্যু, বিবাহ-শ্রাদ্ধ, পাপ-পুণ্য, কলঙ্ক-অকলঙ্ক, নটীর-হাটের যত প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য ঘটনার ঢেউ শেষ পর্যন্ত আছড়ে এসে পড়ে এখানেই। স্টেশনের সামনে এই এক-শ দেড়-শ গজের নানান ভিড়ের মধ্যেই। নটীর-হাটের এই প্রবেশমুখে, যত চেনা-অচেনার যাওয়া আসার পথের ধারে।

ওই যে লাঠি হাতে, চটি পায়ে, চাদর গায়ে বুড়ো মানুষটি চলেছেন, তাঁর শিখায়-বাঁধা কাঠগোলাপ উনিই হলেন নটীর-হাটের চক্রবর্তীদের বারো শরিকের এখনকার দিনের সবচেয়ে প্রবীণ। আমার সঙ্গে দেখা হলেই বলেন, "নটীর-হাটের কথা বলছ ত? না, আমরা এখানকার সবচেয়ে পুরনো বাসিন্দে নই। রাম কুণ্ডুকে চেন ত, এখানে যার সতেরখানা বাড়ি আছে? তাকে সব দিয়ে গেছে উলুপী বারুণী। গদাই সাধুখাঁকে চেন? যার সাতটা ইট-কাঠের গোলা, পেট্রোল-পাম্প, সিনেমা আছে? সে পেয়েছে তার ঠাকুরদার কাছ থেকে সৌরভীবালার সম্পত্তি। অধর পালকেও চেন, লোহা আর সোনা দুই-ই তার অনেক। সে ভোগ করছে সুখদার দান। এই পাল, কুণ্ডু, সাধুখাঁদের দেশ নটীর-হাট। অবিশ্যি সবাই পরের সম্পত্তিতে বড়লোক নয়, নিজেরও আছে অনেকের। ব্যবসাটা ওদেরই একচেটে।"

"কি ওই উলুপী, বারুণী, সৌরভীবালা, সুখদারা কারা?"

"ওরা সেকেলে নটী, অর্থাৎ বেবুশ্যে। নটীর-হাটের আদিবাসিনী। তবে শোনো, তখন সেই···"

থাক, প্রসঙ্গান্তরে চলে যাচ্ছি আবার। যদি ওঁকে জিজ্ঞেস করা যায়, কিন্তু এত ব্রাহ্মণ-বসতি হল কী করে, ফোকলা দাঁতে হেসে বলেন, ধর্মের কলে।

উনি বেশি বলেননি। ধর্মের কলটা বতাসে কিংবা আর কিছুতে নড়ছিল, সেটা ধরা পড়েছে, আমার চিলে-কোঠার ঘুলঘুলিতে। তাহলে চক্রবর্তীদের ইতিহাস···

সেসব থাক্। ওই ঘোড়ারগাড়ির ভুনু গাড়োয়ান যেদিন ওর আগুনের মত ষোড়শী বউ ঝুনিয়াকে নিয়ে এল প্রথম·· থাক সেসব।

ওই যে যাচ্ছেন ফণীন্দ্র ঘটক, তাঁর পরমাসুন্দরী সাত মেয়ের কথা···না, সেটি এখন নয়।

গজেন্দ্রগমনে যাচ্ছে পথের মাঝখান দিয়ে ধবধবে ফর্সা, মেদবহুলা বাড়িউলী স্থখবালা, গোটা মালপোঁতা পাড়াটা ওর নিজেরই। ওর গায়ের ভাঁজে ভাঁজে আছে নটীর-হাটের আদি ইতিকথা। তের বছরের মেয়ে যেদিন প্রথম এল···থাক, সেই অপ্রাসঙ্গিক কথাই এসে যাচ্ছে বারবার। তা হলে মালপোঁতা পাড়ার অজ্ঞাতকুলশীল শিরীশ কেমন করে কার্তিক হালদারের মেয়ের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ল, সে কথাও বলতে হয়।

আর ওই যে যাচ্ছে স্থধারাণী বন্দ্যোপাধ্যায়, নটীর-হাটের হাল-কলেজের ছাত্রী, ওর কিংবা অধ্যাপক ত্রৈলোক্যনাথ গুপ্ত কিংবা কৃষ্ণপ্রিয়া স্কুলের মাষ্টার রেণুপদ নাথের জীবন-বৃত্তান্ত সামান্য জিনিস নয়। কোন্‌টা সামান্য। নটীর-হাটের এম এল-এ অথবা শ্রমিক-নেতা, সাহেব—সাহেবকুঠি, ক্লাব, সাহেবদের পরকীয়া প্রবৃত্তি—কিছুই যাবে না ফেলা।

আমি ত আজকে এসব বলতে বসিনি। তবু যে বলতে হল, তার কারণ, যা বলব, তা নটীর-হাটের বৃন্তছেঁড়া একটি কুস্থমের মত। তাই এত কথা।

আমার ঘুলঘুলি দিয়ে দেখতে পাচ্ছি অবনীকে। তার বিষয়ই হচ্ছে নটীর-হাটের সবচেয়ে হালের ঘটনা। যে ঘটনা নিয়ে নটীর-হাটে অনেক আলোড়ন হয়েছে। অবনীকে দেখলে এখনো যে আলোড়নের ছায়া লোকের চোখে ফুটে ওঠে।

স্টেশন থেকে নেমে, কোনরকমে একটি টুথপেস্ট কিনে অবনী হন্ হন্ করে চলেছে বাড়ির দিকে। ওর চীনা-বাড়ির চিকন মস্থণ মোটা সোলের জুতোর শব্দ শুনলেই বোঝা যায়, খুশিতে ডগোমগো কুরঙ্গটা যেন লাফিয়ে লাফিয়ে চলেছে।

নটীর-হাটের মধ্যে বাছা স্থন্দর কয়েকটি ছেলের মধ্যে ও একটি। চোখা নাক, টানা চোখ, রক্তাভ ঠোঁট আর ধবধবে ফর্সা রং, কিন্তু একেবারেই উন্নাসিকের মত দেখায় না। মাথার চুল কোঁকড়ান নয়, বড় বড় কয়েকটি ঢেউয়ে যেন একটি বিহ্বল অবসাদ চুলের বিন্যাসে। সেটিও বিচিত্র একটি সৌন্দর্য। এমনিতেই অবনী স্থন্দর, তার উপরে নিপুণ হাতে টাই বেঁধে, কোট চাপিয়ে যখন বেরোয় ওর সেই সাবলীল ভঙ্গিতে, তখন পুরুষের ভিড়ে পুরুষ দেখেও তাকিয়ে থাকতে হয় একটুক্ষণ। ইংরেজীতে অনার্স নিয়ে সে বি-এ পাশ করেছে। তারপর তেইশ বছর বয়সেই একটা ভাল চাকরি পেয়ে গেছে বিলিতি মার্চেণ্ট আফিসে।

আমি দেখছি, অবনী যাচ্ছে। দক্ষিণ দিকে খানিকটা গিয়ে বেঁকে গেল পূবে। তারপরে আবার দক্ষিণে, পূবে আবার, দাঁড়াল গিয়ে সেই বাড়িটার সামনে। সেই মান্ধাতার আমলের বাড়ি, যেটা প্রায় বিঘে দুয়েক জমি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে শতাব্দীর উপরে। এ-বাড়ির খ্যাতি শুধু নটীর-হাটে নয়, সারা বঙ্গে। নাম বললে সবাই চিনি চিনি করে উঠবে, তাই পরিচয়টা চাপা থাক। অবনী এই বাড়ির বিখ্যাত বংশের ছেলে।

আমি ওকে আজ দেখছি, আরম্ভ করছি তিন বছর আগে থেকে। তখন ওর চাকরি-জীবন শুরু হয়ে গেছে। তিন বছর আগে, সেদিনও সন্ধ্যাবেলা ঠিক এমনিভাবে এ বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল অবনী। কিন্তু থমকে দাঁড়াল সেকেলে বাড়িটার গজাল-মারা সদর-দেউড়ির সামনে। ইলেকট্রিক নেওয়া হয়েছে, তবু বাড়িটার গা থেকে পিদিম-হ্যারিকেনের রেশ ঘুচতে চায় না। দেউড়ির আলোয় মনে হয়, গত শতাব্দীর সেই ভূতুড়ে আলোটাই যেন জ্বলছে। সামনে পোড়া উঠোন আর ভাঙা ঠাকুরদালান, ওখানটা অন্ধকার। পাঁচ শরিকের যাওয়া-আসার পথ, তাই কেউ তার ভাগের সামান্য মিটার ওখানে খরচ করতে রাজী নয়। ইঁদুর ছুঁচো ব্যাঙ ছাড়া সাপও থাকতে পারে, আছেও। তবু।

উঠোনের বাঁ দিকে যে ঘরগুলিতে আলো দেখা যায়, ওগুলি অবনীদের। বাবা, মা, ভাই, বোন সব মিলিয়ে সংসার ওদের, এখনও পুরনো বংশ হিসেবে খুবই জমাট।

অবনী থমকে দাঁড়াল। ওদিকটায় ও যেতে চায় না। কার্তিক মাসের হেমন্ত-জ্যোৎস্নায় এখনও কোথায় শরতের সোনার আভাস রয়ে গেছে একটু। তার উপরে হৈমন্তিক কুয়াশা-কুহকের একটু রেশ নির্বাক কৌতুকে রয়েছে চেয়ে। যেন পোড়া উঠোন আর ঠাকুরদালানে ঘাপটি মেরে বসে আছে কারা আলো-আঁধারিতে।

অবনী যেতে চায়, ওদের ঘরগুলি পেরিয়ে, ন-জ্যাঠামশায়ের পরিত্যক্ত মহলটায়। কিন্তু ঘরের লোকে দেখে ফেলে, সেই ভয়। উঠোনে ঢুকে, বাঁদিকে উপরে ওঠার সিঁড়ি। কিন্তু ভাঙা। উপরে এখন আর মানুষ ওঠে না। যে-কোন মুহূর্তে ভেঙে পড়তে পারে হুড়মুড় করে। এই ভাঙা সিঁড়ি দিয়ে উঠে, একটি চোরা সিঁড়ি আছে পিছনের মহলে যাবার। কিন্তু… এগিয়ে গেল অবনী পা টিপে টিপে। পায়ের চাপে সিঁড়িগুলিই দুরু দুরু করে, কিংবা ধুক্ ধুক্ করে নিজের বুক, ঠিক ধরতে পারে না অবনী।

অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে, সবে মাত্র চোরা-সিঁড়ির শেষ ধাপটায় এসেছে। এমন সময় অস্ফুট আর্তনাদ শুনে থমকে গেল। দেখল, সামনাসামনি দাঁড়িয়ে ভয়ে জড়োসড়ো ললনা। চিনতে ভুল হয়নি, তাই।

অবনী তাড়াতাড়ি বলল, "আমি, ললনা, আমি অবনী।"

ললনা কাঁপছিল। আর একটি শীৎকার দিয়ে ও অবনীর বুকের কাছে ঘেঁষে এসে ত্রাস-ফিসফিস গলায় বলল, "মা গো! কী ভয় যে পেয়েছিলুম! —এখানে কী করে এলে?"

"ওধারের পুরণো সিঁড়ি দিয়ে।"

"কী সর্বনাশ। যদি সাপ খোপ—"

ললনার কথার উপরেই অবনী ঠোঁট চেপে দিল।

ললনা বলল, "এত ভয় কিসের যে, এমন খারাপ পথ দিয়ে এলে?"

অবনী বলল, "মার চোখে যে সন্দেহটা দেখা দিয়েছে, সেটা চাপা দেবার জন্যে। সামনে দিয়ে এসে তোমাদের দোর ঠেলতে হবে না। ভাববে, তবু ছেলেটা একদিন ললনাদের ওদিকে যাওয়া কামাই দিয়েছে।"

ভয় ছিল না ললনার বাবা-মাকে। ওরা এ-বাড়ির লোক নয়, দুর্গতির দায়ে কলকাতা থেকে এসে আশ্রয় নিয়েছে আজ ছ মাস। অবনীর ন-জ্যাঠামশায়রা প্রায় দু-পুরুষ ধরে আছেন কলকাতায়। নটীর-হাট থেকে মুছে গেছেন তাঁরা। কিন্তু শরিকানার ভাগটুকু খালি রাখতে হয়েছে। এখন এসে আশ্রয় নিয়েছেন ন-জ্যাঠামশায়ের ভায়রাভাই, অর্থাৎ ললনার বাবা। ভদ্রলোক নিজের জীবনটা মামলার বাজি খেলে হেরে গেছেন নিজের জ্ঞাতিগোষ্ঠীর কাছে। সব হারিয়ে এসেছেন, আর কারও নয়, ভায়রাভাইয়ের পোড়োভিটায়। ইতিমধ্যেই নটীর-হাটের মার্কেটে বেশ খাপ খাইয়ে নিয়েছেন নিজেকে। মনে হয়, ঠিক নটীর-হাটের আদিবাসিন্দা যেন। প্রায় প্রতিদিনই নানান পার্টির সঙ্গে যান মহকুমা আদালতে, সাক্ষী হিসেবে। হক কথা না বলুন যুধিষ্ঠিরের বিকিকিনির হাটে বিকোচ্ছেন মন্দ নয়।

সে-কথা যাক। ভদ্রলোকের কিছু না থাক, রূপ ছিল ঘরে একরাশ। নিজের মধ্যবয়সী স্ত্রী থেকে তিন মেয়ে সব কটি শুধু রূপ নয়, অপরূপ। একটা ভয়ঙ্কর সর্বনাশের মত, যেন বৈশাখের তপ্ত-বাতাসে শিয়রে রাখা অগ্নিশিখা। অবনীর মায়ের মনের কথায়—পোড়োবাড়িটায় যেন কতগুলি নাগিনী ঘুরছে কিলবিল করে।

আমি আমার চিলে-কোঠার ঘুলঘুলি থেকে দেখতে পাই, নটীর-হাটের

যত বাদলাপোকাগুলি পড়ন্তবেলায় যায় অবনীদের নির্জন পাড়াটায়। দেখে ভাবি বাদলাপোকা শুধু আগুনে পোড়ে না, সুযোগ পেলে তাদের সাপেও সাপটে দেয় টপাটপ।

ওই একরাশ রূপের একটি বড় মেয়ে ললনা। অবনীর পাশে, একটি সুদৃশ্য সোনার হারের সুন্দর লকেটের মত। সু-গৌরী, একহারা, কিন্তু একটি আশ্চর্য ধার ওর দেহ-লাবণ্যে। খর চোখে দীপ্ত দুটি তারা। যে দিকে চায়, সেখানেই দাগ দিয়ে দেয় একটু। কিন্তু রক্তাভ ঠোঁট দুটি কেমন যেন বিলিতী পুতুলের মত বিহ্বল আবেশে ফুলো ফুলো। তার উপরে, এই অভাবের মধ্যেও ললনা সজ্জা পটীয়সী! প্রথম যেদিন চোখে চোখ পড়ল, দাগ পড়ে গেল অবনীর বুকে। তারপর শিকড় গাড়তে গাড়তে, জড়িয়ে ধরল আষ্টেপৃষ্ঠে।

ললনার বাবা মা এসব দেখেও দেখেননি। কিন্তু দেখতে ভোলেননি অবনীর বাবা-মা, ভাই-বোন, আরও পাঁচ শরিকের খুড়ো-জ্যাঠা-দাদারা। প্রথমে কানাকানি, তারপরে ফিসফাস্, তারও পরে গুঞ্জন। কিন্তু এই দু বিঘে পুরনো বাড়িটার ভিতরেই যত। পারিবারিক ব্যাপারটা কেউ বাইরে টেনে নিয়ে যান নি।

অবনী একটু সাবধান হওয়ার চেষ্টা করল। তাই অন্ধকারে, ভাঙা পরিত্যক্ত চোরা-সিঁড়ি দিয়ে, গোখরোর খোলস মাড়িয়ে এই দুঃসাহসিক অভিসার।

ধরা পড়ে গেল সেটাও। আন্দোলন উঠল সারা বাড়িতে।

কিন্তু এই দুজনের আন্দোলন তার চেয়ে অনেক বেশি। গোটা বাড়িটা এঁটে উঠতে পারল না। ওরা দুজনে হল আরও বেপরোয়া। মাঝখান থেকে ছলনাটুকু গেল। অবনী সোজাসুজি নিজেদের উঠোন পেরিয়েই যাতায়াত করতে লাগল ললনাদের মহলে।

অবনীর মা রান্নাঘরে ভাত দিতে এসে, অভিমান-ক্ষুব্ধ গলায় বললেন, "এসব কী হচ্ছে! তুই না বড় ছেলে এ-ঘরের! তবে যা খুশি তাই কর, আমি যাই কিছুদিন দাদার বাড়ি।"

অবনী বলল, "তার চেয়ে তোমরা থাক, আমিই চলে যাব।"

মনে মনে ভয়ে বিস্ময়ে শিউরে উঠে চুপ করে রইলেন অবনীর মা। ঘর ছাড়তেও ছেলে রাজী আছে তবে!

বাবা ত মুখে একেবারে কুলুপকাঠিই এঁটেছেন। এখন চেয়েও দেখেন না। অবনীর রোজগার ছাড়া সংসার চলবে না, ওঁর মুখে-চাবির ওইটিই কারণ। যদিও জানেন, ছেলে তাঁর বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, রূপে, ব্যবহারে ও কথায়, গোটা নটীর-হাটে প্রায় বেজোড়।

সব জানে, কিন্তু প্রাণ মানে না অবনীর। ললনার চোখের তারা ওকে টেনে নিয়ে যায়। সাড়া পড়ে গিয়েছে রক্তে, তাকে কী দিয়ে আটকে রাখবে অবনী।

রক্তে দোলা লেগেছে ললনারও। একটু দেরি হলে ঝড় ওঠে তার দু চোখে। অবনী কাছে এলেই, দু চোখে আলো জেলে যেন আরতি করে। ঠোঁট দুটি আর একটু ফুলিয়ে বলে, "এত দেরি করলে যে?"

"দেরি কোথায়? পাঁচ মিনিট ত।"

"ওইটুকুই অনেকখানি।"

অবনী অবাক বিস্ময়ে বিহ্বল হয়ে ললনার রূপ দেখে ডুবে যায়। তার চেয়ে বেশি ললনা। অবনীকে বলে, "তুমি যখন আমার রূপের প্রশংসা কর, মনে হয় ঠাট্টা করছ।"

"কেন?"

"নিজের রূপটা বুঝি তাকিয়ে দেখ না?"

দেখে, কিন্তু সেটা স্বীকার করার মত অবিনীত নয় অবনী। বলে, "পুরুষের আবার রূপ!"

ললনাও কথা জানে। বলে, "হ্যাঁ, সেটা বলার জিনিস নয়, মনে মনেই জানি। তা ছাড়া, তোমার কত গুণ! তোমার পায়ের যুগ্যিও নই আমি।"

অবনী বলে, "তা ঠিকই। কেননা, তুমি যে বুকের যুগ্যি।"

"আহা, ইয়ার্কি!"

কখনও বলে, "আচ্ছা, তোমার হাতের লেখাটা তুমি কি দিয়ে লেখ?"

অবনী হেসে বলে, "কেন, হাত দিয়েই।"

"তোমার হাতে তবে ছাপাখানার মেশিন বসান আছে। আশ্চর্য! কী সুন্দর তোমার হাতের লেখা!"

কথাটা ঠিক। অফিসে বড় সাহেব থেকে আর্দালীটি পর্যন্ত তার হাতের লেখায় মুগ্ধ। তার ইংরেজী ড্রাফ্‌ট না হলে ছোট সাহেবের মন ওঠে না। নটীর-হাটের ও অফিসের বন্ধুদের অনেকের ইংরেজী চিঠি লিখে দেওয়ার দায়টা সে সানন্দে নিয়েছে।

অবনী ললনাকে টেনে নিয়ে যায় বাড়ির পিছনের উঠোনের নির্জনে। বলে, "আমার লেখার চেয়ে তোমার কথা যে আরও সুন্দর।"

কিন্তু দেখা যায়, জিতটা শেষ পর্যন্ত ললনার। কেননা অবনীর চেহারা পোশাক, গুণ, সবই অতুলনীয়। ললনার বেলায় ললনা নিজেই মুখথাবাড়ি দেয় অবনীকে।

যদিও ললনা ক্ষীণ রেখায় কাজল টানতে গিয়ে চোখের ধারটা বাড়িয়েই ফেলে বেশি। কাঁধকাটা লাল জামাটার উপরে শাড়িটা এলিয়ে দিতে গিয়েও কষে জড়িয়ে ফেলে কোমরে। তাতে তার যৌবন যেন কী এক সর্বনাশ ও রহস্যের মত বিচিত্রময়ী হয়ে ওঠে।

এমনি করে কেটে গেল আরও ছ'টি মাস—কখনও ভাঙা-সিঁড়ি ভেঙে নড়বড়ে দোতলার ঘরে, কখনও পিছনের উঠোনের হাসনুহানার তলায়, ঘোর সন্ধ্যায়, খিড়কি দোর খুলে, লতাজঙ্গলে আবৃত পরিত্যক্ত বাগানে।

বাড়িতে সকলের অস্বস্তি। নটীর-হাটের মানুষেরা নিশ্চিন্ত। সদরে কোন সাড়াই নেই।

আমি ভাবি, তারপর? ঘুলঘুলি দিয়ে মাঝে মাঝে একটি লোককে আসতে দেখেছি ললনাদের বাড়িতে। বয়স হবে প্রায় পঁয়তাল্লিশ। ললনারা ডাকে বসন্তকাকা বলে। বাড়ি কলকাতায়, অবস্থাপন্নও বটে।

বসন্তকাকা একদৃষ্টে চেয়ে দেখেন ললনাকে। ফোঁস করে নিশ্বাস ফেলে বলেন, "নটীর-হাটে আছ তাহলে ভালই!"

"যেমন দেখছেন।"

"দেখতে খুব ভাল নয় অবিশ্যি, মনে হয় অন্তরে অন্তরে ভালই।"

ললনা কোন জবাব দেয় না। মাথা নিচু করে, আঙুলে ফাঁস জড়ায় আঁচল দিয়ে। বসন্তকাকা শান্ত মানুষ, চোখ-খাবলার মত তাকিয়ে থাকেন ললনায় দিকে। বলেন, "মাসখানেকের মধ্যেই বাড়িটা বোধহয় কেনা হয়ে যাবে। আলিপুরের সেই বাড়িটা।"

অবনী জিজ্ঞেস করে ললনাকে, "উনি কে?"

"বসন্তকাকা।"

"আপন কাকা?"

"না, বাবার বন্ধু।"

এ-কথা সে-কথার পর আজকাল অবনী বলে প্রায়ই, "বাড়ির লোকেরা না বিয়ে দিলে আমরা রেজিস্ট্রি ম্যারেজ করতে পারি।"

অবনীর এ-কথার উপরে ললনা শুধু ওর বিলিতী পুতুলের মত রক্তাভ ঠোঁট দুটি দেয় তুলে। অবনীর অসাড় অনুভূতিতে চাপা পড়ে যায় সিদ্ধান্তটা।

তারপর আমি দেখলাম আমার এই চিল-কোঠার ঘুলঘুলি দিয়ে, আসল সিদ্ধান্তটা বয়ে নিয়ে এলেন বসন্তকাকা। অবনী তখন অফিসে গেছে। বসন্তকাকা একেবারে লরি নিয়েই এসেছেন কলকাতা থেকে। ললনাদের মালপত্র উঠল তার মধ্যে। মালপত্র সামান্যই। ললনার মা-বাবা-বোনেরাও উঠল বসন্তকাকার সঙ্গে।

ললনা উঠবার আগে অসঙ্কোচে এল অবনীদের উঠোনে, একেবারে অবনীর ঘরে। একটি খাম রাখল টেবিলে, তারপর অবনীর মাকে প্রণাম করে, বসন্তকাকার হাত ধরে লরিতে গিয়ে উঠল।

নটীর-হাটের একটি বিশেষত্ব, মানুষ যেমন আসে, তেমন ফিরে যেতে পারে না। নটীর-হাটের স্মৃতি নিয়ে গেল ললনা।

সন্ধ্যাবেলা যখন নটীর-হাটের সদরে আমি শুনতে পেলাম অবনীর পদশব্দ, সাহস করে উঁকি দিতে পারলাম না ঘুলঘুলি দিয়ে।

বাড়ি এসে ন-জ্যাঠামশায়ের উঠোনের দরজাটা সপাটে খোলা দেখে অবাক হল অবনী। অন্ধকার দেখে আরও অবাক।

ঘরে এসে খাম দেখে খুলে ফেলল। চিঠিতে লেখা ছিল, "বসন্তকাকা আমার নামে একটি বাড়ি কিনেছেন আলিপুরে। আমরা এখন থেকে সেখানেই থাকব। আমাদের পুরোনো সম্পত্তি ফিরে পাওয়ার জন্যে বাবাকে সাহায্য করবেন বসন্তকাকা।...নটীর-হাটের স্বর্গবাসে এইটুকু বুঝে গেলাম, সংসারে এখনও কত ভাল মানুষ আছে, কত সুখ ও সৌন্দর্য্য আছে। —ললনা।"

অবনী চিঠি রেখে, হাত মুখ ধুয়ে বলল, "মা খেতে দাও।"

যেন কিছুই হয়নি, এমনি একটি ভাব করে বলল অবনী। কেবল ওর সুন্দর প্রসন্ন মুখের ভ্রু ঠোঁট আর নাকের পাশে কয়েকটি সুগভীর রেখা দেখা দিল। আমার ঘুলঘুলিতে ধরা পড়ল, অবনীর চোখে মুখে ওগুলি বিদ্রূপের চিহ্ন। নিঃশব্দে সব কিছুকেই সে বিদ্রূপ করছে।

তারপর মাসখানেক বাদে, অফিসে ছোটসাহেব প্রথম ওকে ডেকে

পাঠালেন নিজের ঘরে। একটি কাগজ দেখিয়ে বললেন, "এটা কার হাতের লেখা, অবনী?"

"আমার।"

ছোটসাহেবের পায়ের তলা থেকে মাটি সরে গেলেও বোধহয় এত বিস্মিত হতেন না। লাফিয়ে উঠে বললেন, "ইম্‌পসিবল! এত কুৎসিত হাতের লেখা তোমার?"

সত্যি, হাতের লেখাটা অতি কদর্য, বকের ঠ্যাং-এর মত। অবনী নির্বিকারভাবে বলল, "আজ্ঞে হ্যাঁ, আমারই।"

ডেস্‌ক খুলে ছোটসাহেব আর-একটি কাগজ বার করলেন। তাতে ছিল মুক্তোঝরা হস্তাক্ষর। বললেন, "এটা কার হাতের লেখা তবে?"

ও বলল, "আমারই। কিন্তু এখন আর আমি ওর চেয়ে ভাল লিখতে পারিনে।"

ছোটসাহেব হাসবেন না কাঁদবেন, বুঝতে পারলেন না। কয়েক মিনিট প্রায় রুদ্ধশ্বাস বিস্ময়তীব্র চোখে তাকিয়ে বললেন, "কাগজ নাও আমি ডিক্‌টেট করছি, তুমি লিখে যাও।"

অনায়াসে লিখে গেল অবনী, অবিকল সেই কদর্য হাতের লেখাগুলির মতই। ছোটসাহেব আরও খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, "আচ্ছা তুমি যাও।"

চলে এল অবনী। কিন্তু ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই গোটা অফিস হাঁ করে তাকিয়ে রইল অবনীর দিকে। মানুষের পরিবর্তনের সঙ্গে যে তার হাতের লেখাও পরিবর্তন হয়, এমন বিচিত্র ব্যাপার কেউ দেখে নি। ব্যাপার কি?

নটীর-হাটের মানুষের চোখে তখনও কিছু ধরা পড়েনি।

কিন্তু একদিন ধরা পড়ল, চোখে-না-পড়ার ভিতর দিয়ে। অবনীর যাওয়া-আসার পথে, দোকানী আর পড়শী' সবাই ওকে একবার তাকিয়ে দেখত। এইজন্য দেখত যে, পাড়ার সবচেয়ে সুন্দর ছেলেটা যাচ্ছে।

একদিন কেউ ফিরেও দেখল না, কারণ তারা চিনতেও পারেনি যে, অবনী যাচ্ছে। কেননা, নটীর-হাটের কড়ি মিস্তিরির মত, ছোট ছোট চুলের মাঝখানে সিঁথি-কাটা অবনীকে চেনাই দুষ্কর।

ওর ডেলি-প্যাসেঞ্জার বন্ধুরা, নটীর-হাটের মানুষেরা সবাই অবাক্ হল, হাসল, দুঃখিত হল। কেউ বলল, "এ আবার কেমন ফ্যাশান হে।" কেউ বলল, "অমন সুন্দর চুলগুলি! এ কি বিচ্ছিরি, ছি ছি·····"

অবনী হাসে। আমি দেখি, হাসির মধ্যে ওর সেই বিদ্রূপই আরও তীব্র হয়ে উঠছে। কিন্তু তার মুখটা যাচ্ছে বদলে, আর হাসিটা অবিকল নটীর-হাটের তেজারতী কারবারী নফর কুণ্ডুর মত ছুঁচলো আর কুৎসিত হয়ে উঠল।

এর সঙ্গে সঙ্গেই এল একটু শীর্ণতা, গোমড়া মুখ আর অঙ্ক-কষিয়ে বুড়ো-মাষ্টারের মত নীরবতা। চোখে ছানি পড়েনি নিশ্চয়ই। কিন্তু চোখের মণি দুটিও কেমন যেন বিবর্ণ হয়ে উঠল। ধবধবে রংটা গেল কালো হয়ে। শেষে প্যাণ্টশার্টগুলির রং-এর রুচিই শুধু গেল না, শরীরের তুলনায় বড় ঢলঢলে হল।

ঠিক সেই দুটি হাতের লেখার মত। প্রায় চাঁদের সঙ্গে জোনাকির মত তফাত। ছ মাসের মধ্যে ওকে দেখাতে লাগল যেন পসারহীন বয়স্ক উকিলের মত।

আমি ভাবি, এ ভয়ংকর প্রতিশোধটা নিচ্ছে কেন প্রকৃতি, কিসের জন্যে।

নটীর-হাটের ফিস্‌ফাস্ গুঞ্জরিত হয়ে উঠল। মন্দিরে, বৈঠকখানায়, ক্লাবঘরে আর রকের সান্ধ্য-আসরগুলির সব মাথা টনটন করে উঠল ব্যথায়। বাঁড়ুজ্যেদের সেজ শরিকের ঘরের ভিতরে ঘটছেটা কী? হিং-টিং ছট-এর মত উদ্ধারের আশায় ঘোল খেতে লাগল সবাই।

ছোট ছোট ছেলেপিলেরা অবনীর পিছনে লাগল একটু-একটু করে। কেননা, তারা জানে 'অবুদা' পাগল হ'য়ে গেছে। আর পাগল হলেই সে আর মানুষ থাকে না, তখন তাকে ঢিল মারতে হয়, কাদা ছুঁড়তে হয়, পিছনে লাগতে হয়। পথে পড়ে ফণীন্দ্র ঘটকের বাড়ি। তার রূপসী সাত মেয়ে রাস্তার ধারে জানালায় দাঁড়িয়ে হেসে মরে। কেননা, অবনীটা যদি পাগলাই হল, তবে তাদের সাতবোনের খপ্পরে পড়তে বাধা ছিল কোথায়?

এসব শুধু উপরে-উপরে। ভিতরে ভিতরেও অবনীর নতুন পরিবর্তন দেখা গেল। অফিসের লেখায় ভুল বেরিয়ে পড়ে রোজই। সেখানে ওকে করুণা করল সাহেব।

বাড়িতে ত কান্নাকাটির দাখিল। বাবা মরতে লাগলেন গুমরে গুমরে। মা চেয়ে দেখেন জলভরা চোখে। ভাইবোনেরা ভীত, বিস্মিত।

ছ মাস বাদে, মাইনে পেয়ে অবনী বাড়িতে টাকা কমিয়ে দিল অর্ধেক।

মা বললেন, "এ কী, এত কম?"

ও বলল মোটা ঘড়ঘড়ে গলায়, "ওর চেয়ে বেশি দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমার একটা ভবিষ্যত দেখতে হবে ত।"

মায়ের প্রাণটা ধক্ করে উঠল। ও মা! বলে কী। বললেন, "কী বলছিস তুই অবনী?"

অবনী হাসল, "ঠিকই বলছি। আর তা ছাড়া খাওয়ার অত বাছাবাছি কিসের? শুধু ডাল-ভাত করতে পার না?"

মায়ের মনে হল, তিনি জ্ঞান হারাবেন, পড়ে যাবেন ধুলোয়। এটা কে? বাড়ির কারুর খাওয়াপরার দুঃখ যে সহ্য করতে পারে না, সেই ছেলে এই?

তারপর দেখা গেল, অবনীকে ভাত দিয়ে কুলিয়ে উঠতে পারেন না। মুখে নয়, অন্তরে বলেন, শুধু ভাতগুলি অমন রাক্ষসের মত খায় কী করে ছেলেটা। মনে মনে বলতে হল মাকে, কী বিশ্রী খাওয়া!

এখন অবনী সরষের তেল মাখে মাথায় খাবলা খাবলা, ঘসর ঘসর দাঁত মাজে ছাই দিয়ে।

একদিন ঠাকুরদালানের উঠানে এক তাল গোবর দেখে দাঁড়িয়ে পড়ল অবনী। গোবর এরকম বহুদিন চোখে পড়েছে, কিন্তু ফিরেও দেখেনি। হঠাৎ ছোট বোনকে ডাকল কেমন একটা গোঁয়ারের মত করে। বলল, "খেতে পারিস, আর গোবরটুকু কুড়িয়ে দেয়ালে চাপটি মেরে রাখতে পারিসনে। রোজ রোজ অত ঘুঁটের পয়সা আসে কোত্থেকে।"

বিষয়টা সামান্য, কিন্তু কত যে অসামান্য সেইটি ভেবে, আড়ালে বসে আঁচলে মুখ চেপে কেঁদে উঠলেন ওর মা।

অনেকদিন পর সাহস সঞ্চয় করে একদিন মা বলে ফেললেন, "অবনী, ললনাকে তুই বিয়ে করে আন।"

মায়ের দিকে তাকিয়ে ওর এখনকার স্বভাব-কুৎসিত হাসি উঠল ফুটে। বলল, "দোকানের পুতুল নাকি সে?"

আরও কয়েক মাস বাদে দেখা গেল, অবনীর ডান কাঁধটা যাচ্ছে উঁচিয়ে। একটু একটু করে বেশ খানিকটা উঁচু হয়ে শরীরটা গেল বেঁকে। তারপর বাঁ পা খোঁড়াতে লাগল। খোঁড়াতে খোঁড়াতে কোমর বেঁকে হাঁটু ভেঙে কেমন একটা বিশ্রী হ্যাঁচকা দিয়ে হাঁটতে আরম্ভ করল ও।

আমি আমার ঘুলঘুলি থেকে দেখলাম, অবনীর চলার ভঙ্গীতেও একটা ভয়ঙ্কর বিদ্রূপ ফেটে পড়ছে। ঠিক একটা ক্রুদ্ধ ক্ষিপ্ত মানুষ একজনকে ভেংচালে যেমন হয়, সেইরকম।

রাস্তার দুধারে দাঁড়িয়ে রোজ দেখল ওকে নটীর-হাটের মানুষেরা। আর সে সবাইকে যেন ভেংচাতে লাগল এই কদর্য ভঙ্গীতে। চলার তালে তালে

ওর বুকের থেকে একটি শব্দ এসে বাজল আমার কানে, "এই, এই ত ছাখ চেয়ে, এই আমি।"

ঘরে বাইরে সবাইকে জানিয়ে দিল, "আপনি আপনি ওর হাত পা এমনি বেঁকে যাচ্ছে, নার্ভগুলি যাচ্ছে মরে, হাত আর পা যাচ্ছে শুকিয়ে।"

ঘরে বলল, বাইরের ডাক্তার দেখছে। বাইরে বলল, দেখছে ঘরের ডাক্তার।

আর মধ্যরাত্রে আয়নার সামনে ঠিক সেই ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে তেমনি কুৎসিত হেসে বলল, "চব্বিশ বছর বয়স পর্যন্ত অনেক ভান করেছি। আসল রূপটা ফুটেছে আমার এতদিনে।"

আমি আমার চিলে-কোঠাখানিতে বসে ভাবছিলাম, মানুষের মনের চিলে-কোঠায় কতগুলি ঘুলঘুলি আছে।

কিন্তু সামনের রাস্তায় অনেক লোক ওর পিছনে লাগল। অকারণ ডেকে ডেকে নানান কথা জিজ্ঞাসাবাদ করে। কেউ ঠাট্টা করে, করুণা করে কেউ। ছোঁয়াচে রোগের ভয়ও আছে অনেকের।

ওদের বাড়ি থেকে পশ্চিমে, হোমিওপ্যাথি ডাক্তার গোকুল মিত্তিরের বাড়ির কাছে এসে, দক্ষিণ দিক দিয়ে ঘুরে যেতে লাগল রোজ। আগে যেত গোকুল ডাক্তারের বাড়ির উত্তর দিক দিয়ে।

এতদিন আমার ঘুলঘুলি থেকে যেটা দেখেও দেখিনি, তা হল দুটি চোখ। লক্ষ্য করে দেখলাম, অবনীর যাওয়া-আসার সময়টিতেই ঠিক নির্বাক নিশ্চল পটের মত সেই চোখ দুটি গোকুল ডাক্তারের জানালার গরাদ থেকে তাকিয়ে থাকে অপলক। সেই চোখে যত মুগ্ধতা, তত বিস্ময়, তত করুণা!

চোখ দুটি গোকুল ডাক্তারের মেয়ে পারুলের। মনে পড়ল, পারুলের চোখদুটি এমনি পটে আঁকা ছবিটির মত তিন বছর ধরে তাকিয়ে আছে। কারও চোখে পড়ে না। অবনীরও পড়েনি।

পারুলের রূপ বলতে কিছু নেই। কালো রং, সাদাসিধে মুখ। আটপৌরে শাড়িতে কুড়ি বছরের একটি নির্জন নদীর জোয়ার আপন উল্লাসে টলোমলো। অতি সাধারণ চোখ দুটিতে অতল গভীরতা। চুলগুলি বাঁধে রোজ আঁট-খোঁপা করে। পারুলকে চোখে পড়তে চায় না।

আমার মত অবনীটাও কানা ছিল এতদিন। এতদিন ও উত্তরে বেঁকেছে। এখন দক্ষিণে বেঁকতে গিয়ে সহসা একদিন চোখ পড়ে গেল পারুলের চোখে।

পারুলের মুগ্ধ বিস্মিত করুণ চোখ দুটিতে কী ছিল, কে জানে। অবনীর উঁচিয়ে ওঠা কাঁধটা হঠাৎ একটু নেমে গেল যেন।

তেমনি লেংচে খানিকটা এগিয়ে আবার ওর কাঁধটা উঁচু হল।

পরদিন মনে ছিল না। কিন্তু চোখাচোখি হতেই, অবনীর কাঁধ আর বাঁ পা-টা সহসা যেন নাড়া খেয়ে সোজা হয়ে উঠল।

আমিও নাড়া খেয়ে গেলাম আমার এই অদৃশ্য চিলে-কোঠার মধ্যে। এ যেন কেমন এক শক-ট্রিটমেণ্ট শুরু হয়ে গেল অবনীর।

কিন্তু পরমুহূর্তেই ও আবার লেংচে বেঁকে চলল উত্তরে। দূর থেকে একবার আড়চোখে ফিরে দেখল।

অথচ পরদিনই আবার তেমনি নাড়া খেয়ে সোজা হয়ে ওঠার লক্ষণ দেখা গেল অবনীর। মুখে বিদ্যুৎ-চকিতে দেখা দিয়ে গেল সেই কোমল মিষ্টি ভাবখানি। কিন্তু সবটুকু বিদ্যুৎ-চমকের মতই। রোজই প্রায় চলল এরকম।

আর আমি দেখলাম পারুলের মুগ্ধ চোখদুটিতে এক বিচিত্র আবেগের সঞ্চার। জানালায় থাকার সময়টা গেল ওর আরও বেড়ে। যেন এই নটীর-হাটের মত, নটীর-হাটের আকাশের মত—চিরদিন সে জানালায় বসে থাকতে চায়, থাকবে। ছিলও তাই, বারো বছর বয়স থেকে, উমার তপস্যার মত।

আমি দেখলাম পরম কৌতূহলে, অবনীর কাঁধটা কেমন সমান হয়ে আসছে, পা-টা খুব ধীরে ধীরে ধীরে, একটু একটু করে সোজা হয়ে উঠছে। তারপরে কেশে-বেশেও যেন একটি অস্পষ্ট পরিবর্তন দেখা দিল। হাসিটা ফিরে পেতে লাগল আগের মাধুর্য।

সেটাও সকলের চোখে পড়ল, ঘরে ও বাইরে। কিন্তু রহস্যটা ধরা পড়ল না কারুর কাছে।

তারপর একদিন ফেরার পথে, সন্ধ্যাবেলা অবনী দাঁড়িয়ে পড়ল পারুলের জানালাটার কাছে। একবার পারুলের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ একটু সলজ্জভাবেই মাথা নত করল সে। ওর পুরনো কণ্ঠস্বরে জিজ্ঞেস করল, "গোকুলকাকা ভাল আছেন?"

পারুলের মনে হল, ওর নির্জন নদীটা হঠাৎ বানে এক্ষুনি প্লাবিত হয়ে যাবে। কোনোরকমে বলল, "হ্যাঁ।"

চলে গেল অবনী।

পরদিন আবার দাঁড়াল। বলল, "গঙ্গার ধারে শিবের ঘাটে আসবে?"

পারুলের বুকের মধ্যে কাঁপছিল থরথর করে। বলল, "যাব। আপনি যান।"

প্রায় আগেরই মত হেঁটে অবনী নির্জন শিবের ঘাটে এল। সন্ধ্যা তখনও উৎরোয়নি। নটীর-হাটের পশ্চিমাকাশে লাল রং লেগে আছে তখনও।

অবনী ভাবতে চেষ্টা করল এটা কোন্ ঋতু, কী মাস। বাতাসে ঈষৎ শীতের আভাস আছে।

পারুল এল। দাঁড়াল একটু দূরে। নির্জন নদীটি সঙ্গমের বাঁকে এসে থমকে গেছে যেন।

অবনী বলল, "এস।"

পারুল কাছে এল। এসে, তাকিয়ে আবার চোখ নামাল। দুজনেই খানিকক্ষণ চুপচাপ।

অবনী বলল, "এমন করে রোজ কী দেখ পারুল।"

বলতে গিয়েও পারুল প্রথমে জবাব দিতে পারল না। কয়েকবার জিজ্ঞাসার পর বলল, "বুঝতে পারেন না?"

পারুলের দিকে তাকিয়ে চুপ করে রইল অবনী। তারপর বলল, "পারি। কিন্তু কেন পারুল?"

পারুল তাকাল ওর সেই মুগ্ধ চোখ তুলে।

আবার দুজনেই চুপচাপ।

খানিকক্ষণ পর পারুল বলল, "আপনার অসুখ একেবারে সেরে গেছে?"

সেইটাই ভয় করছিল আজ অবনীর। সত্যি, সেরেছে ত? ওর রোগ পঙ্গুতা, ভীরুতা, নীচতা। গলার কাছে বড় শক্ত লাগছিল কিছু। পারুলের হাত ধরে তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে বলল, "বুঝতে পারছিনে পারুল।"

কিন্তু পারুলের চোখে কোন সংশয় নেই।

নির্জন ঘাট। অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে আরো। পারুল নিজেই ওর মুখখানি বাড়িয়ে নিয়ে এল অবনীর দিকে।

অবনীর অসুখটা যেন শেষবারের মত বেড়ে উঠল। বিকৃত ক'রে, চোখ কুঁচকে সে তাকাল পারুলের চোখের দিকে, ঠোঁটের দিকে।

পরমুহূর্তেই তার মুখ চোখ স্নিগ্ধ হ'য়ে উঠল। জল এল বোধ হয় চোখে। আকণ্ঠ-পিপাসায় পারুলের ঠোঁটের ওপর নেমে এল সে চাতকের মত। বলল, "হ্যাঁ, সেরেই তো উঠেছি পারুল।"

চোখ ফিরিয়ে নিলাম ঘুলঘুলি থেকে। অবাক হয়ে ভাবলাম, ঘরের কোণে

পড়ে থাকা ওষুধ-লতার এমনি গুণ নাকি ! শুধু দুটি চোখের তারায় অসুখও সেরে যায় এই মানুষের সংসারে !

নটীর-হাটের মাথাব্যথা আবার একবার নতুন করে গুণগুণ করে উঠল কয়েকদিন। কেউ বলল, "ভূতে ধরেছিল।" কেউ বলল, "না, এরকম একটা রোগ সম্প্রতি দেখা দিয়েছে। সেবারে আমার দিদির···"

"মুণ্ডু ! খোঁজ নিয়ে দেখ, নির্ঘাত কোন তালে ছিল। ফেরেব্বাজ নয়ন সাধুখাঁ জালিয়াতির দায়ে একবার বোবা আর কালা হয়ে গেছল, মনে আছে ?"

বাসু পুরুতের গলির মোড়ে দাঁড়িয়ে বললে গদাই, "ওসব শালা কিছু নয়, সেরেফ ভি-ডি বাবা। গদাশালার চোখ ফাঁকি দিতে পারবে না, ওসব শালা অনেক, শালা···"

তা বটে। গদা একসময়ে হামা দিয়েও চলেছে। এর উপরে আর কথাই নেই।

মহাযুদ্ধের পরে

ঘটনার আগের দিনের রাত্রি এটা।

বৃষ্টিটা হবে কিনা, ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। তবে আকাশ আর আবহাওয়াটা যেন সব দিক দিয়েই তৈরি আছে। কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকার, মেঘের ঘন ঘটা, ভেজা ভেজা ভারি পূবে বাতাস, বায়ুকোণ থেকে আকাশের বহুদূর পর্যন্ত বিদ্যুতের হানাহানি, গুড়ুগুড়ু গর্জন, সব আছে। না বর্ষেও রাতটা যেন পুরোপুরি বর্ষার।

হাটের দিন নয়। বাজারের চালাগুলিতে ইতিমধ্যেই বেচাকেনার পাট চুকিয়ে, বাতি নেভাবার পালা শুরু হয়ে গেছে। আরো একটু সময় হয়তো চলত হিসেব-নিকেশ, বাতি জ্বলত। কিন্তু আকাশে বড় ঘটা। বর্ষাকে ত্বরান্বিত করতে বোধহয় ওইটুকুতেই মানুষের হাত আছে। মাথা মুড়ি দিয়ে অন্ধকারে একটা মেঘ-মেদুর অনুভূতি নিয়ে শুয়ে পড়া।

চালাঘরগুলির পূবে ইছামতীর জলও দেখা যায় না। অন্ধকারে মেশামিশি করে আছে। কেবল চিকুর ঝিলিক যখন তারো বুকে বসছে কেটে কেটে, তখন টের পাওয়া যায়, স্রোত পাক খাচ্ছে ওখানে। জোয়ার না ভাঁটা, ঠাহর হয় না, শব্দ শোনা যাচ্ছে শুধু, ছল্ ছল্ ছলাৎ! তারো যেন বৃষ্টিরই প্রতীক্ষা।

ভারি বাতাসের ঝাপটা খেয়েও পুরুষ জোনাকিগুলি মিটিমিটি বাতির ইশারায় ফুস্‌লে বেড়াচ্ছে নিচের মেয়ে জোনাকিদের। উচ্চকিত হচ্ছে ঝিঁঝিঁর ডাক। সেটা মানুষকে শোনাবার জন্যে নয়। যে-বাসনায় জোনাকি জ্বলে ওঠে, সেই বাসনার উন্মাদনায় পুরুষ ঝিঁঝিঁটা চেঁচিয়ে বীরত্বের ফাঁদ পাতছে মেয়েটার জন্যে।

অন্ধকার গাঢ় হচ্ছে ক্রমে। আর এই অন্ধকারে, মেঘলা রাতে, জলো বাতাসে তল্লাটের কুকুরগুলি পরস্পরের মধ্যে পাড়া ও আঁস্তাকুড় ভাগাভাগির সমস্ত চুক্তি, সন্ধি ও বন্ধুত্ব ভুলে গেছে। তাড়া লড়ছে, রক্তারক্তি করছে। ঋতু-কয়েদীগুলির রক্ত ছাড়া পেয়েছে এই বর্ষার মরসুমে। এখন আর কোনো চুক্তি সন্ধি ওরা মানবে না।

নারকেল গাছের ভিড় বেশি চারদিকে। বাতাসে তাদেরই দোলানি আর ডাক।

বাজারটাকে দু'ভাগ করে পাকা রাস্তা চলে গেছে অনেক দূরে, ইছামতীর গা ঘেঁষে ঘেঁষে। শেষ হয়েছে গিয়ে ইছামতীরই তটে।

আপ আর ডাউনের শেষ দুটো মোটর বাস্-ই চলে গেছে কিছুক্ষণ আগে। একটা কলকাতায় গেছে, আর একটা কলকাতা থেকে গেছে ইছামতীর কূলে।

শেষ বাস দুটো দেখে ওরা দুজনেই নদী-কিনারের হোটেলে খেয়ে এসেছে চুক্তি অনুযায়ী। দেড়ো-ব্যালাইণ্ডা বটা আর ব্যালাইণ্ডা স্থলা। নামগুলি একটু অদ্ভুত। বিদেশী নয়। নিতান্তই দেশী নাম, আর এ অঞ্চলেরই কালো কালো দুটি পুরুষ। নাম বটা আর স্থলা। বাকিগুলি বিশেষণ, দুজনের খ্যাতির ও খাতিরের বাহন। হোটেলের চুক্তিটা আর কিছু নয়, শেষ যা থাকে, ওদেরই। অত্যন্ত দায়িত্বপূর্ণ চুক্তি। যে-দিন কিছু থাকে না প্রায়, সে-দিন ওদেরো ফাঁকা।

খাওয়ার শেষে লাঠি ঠুকে ঠুকে দু'জনে রাস্তাটা পার হয়।

বটা একটু লম্বা, ঘাড় অবধি সোজা খাড়া আর শক্ত, মাথাটা নোয়ানো। এলোমেলো, খাপছাড়া দাড়ি তার মুখে। স্থলা চওড়া, পেটা পেটা শরীর, একটু বেঁটে।

স্থলা এসেছে ইছামতীর ওপার থেকে। বটা এপারের। দু'জনেই আছে এই বাজারের তল্লাটে অনেকদিন, অনেক বছর ধরে। কত বছর, সেটা ওরা জানে না, কারণ ওরা হিসাব রাখতে পারে না। দশ বছর হতে পারে, বিশ বছরও হতে পারে। নিজেদের বয়স ওরা জানে না। তিরিশ হতে পারে, চল্লিশ-পঞ্চাশও হতে পারে। দেখলে কিছুই প্রায় অনুমান করা যায় না।

কলকাতার বাস যায় এখান দিয়ে, আর বাজারটা আছে। এইটি দুজনের একমাত্র আকর্ষণ।

কে একটা বাস-যাত্রী দেশী সাহেব, অনেককাল আগে, স্থলাকে বলেছিল, তুম্ ব্লাইণ্ড্ আছে?

স্থলা বলেছিল, ব্যালাইণ্ড্? সেটা কি বাবু?

ব্লাইণ্ড, ব্লাইণ্ড! আন্ধা।

স্থলার চোখ খোলা, ঘষা-ঘষা দুটি তারা, কিন্তু জন্মান্ধ। সাঁহেব তাকে অন্ধ বলে প্রথমে যেন বিশ্বাস করতে পারে নি।

স্থলা সাহেবের মাথার উপর অন্ধ চোখ রেখে বলেছিল, হ্যাঁ, আমি কানা, ভিখ-মাগা কানা।

সাহেব ভিক্ষে দিয়েছিল। আর স্থলা চিৎকার করে বলেছিল বটাকে, জাইনলি রে বটা, অন্ধও না কানাও না, আমি ব্যালাইণ্ড। তুইও ব্যালাইণ্ড।

বাজারের সবাইকে ডেকে ডেকে বলেছিল, আপনেরা সকলে শুইনে রাখেন গো ব্যাপারী মোহাজনরা, আমরা ব্যালাইণ্ড।

পরে সেটা ডাকাডাকি, হাসাহাসিতে 'ব্যালাইণ্ডা'য় দাঁড়িয়েছে।

বটার চোখে মনি নেই, পচা মাছের পটকার মত দুটো ড্যালা ঝুলে আছে। সেও জন্মান্ধ।

দুইই জন্মান্ধ, দুজনেই ভিক্ষে করে। বটা গান গেয়ে আর স্থলা সুর করে কথা বলে ভিক্ষে করে।

লাঠি ঠুকে ঠুকে পার হয় দু'জনে রাস্তাটা। ওপারে গিয়ে আরো খানিকটা দক্ষিণে যায়। বাজারের চৌহদ্দি পেরিয়ে—যেখানে পাটের খালি গুদাম-ঘরগুলি রাস্তার দু'পাশে এক রাশ অন্ধকার গিলে গুহার মতো দাঁড়িয়ে আছে। পাট এখন চাষ হচ্ছে মাঠে। পাইকাররা টাকা নিয়ে ঘুরছে চাষীদের কাছে। গুদাম ঘরগুলি এখন হা-হা করছে, পড়ে আছে বে-ওয়ারিশ। অধিকার আছে শুধু বুড়ি রোগা গরুর, কুকুরের আর ব্যালাইণ্ডাদের।

স্থলা বলে, কোন্‌টায় যাবি? বড়টায় না ছোটটায়?

বটা জবাব দিল, বড়টায়। বিষ্টি হলি, জল পড়ে ছোটটায়।

বড়টায়ও পড়ে।

কিন্তন্ জায়গা বেশি।

বটা নাক কোঁচকাল, উঁ, শেয়াল যায় ডাইনা দিয়া।

স্থলা বলল, হুঁ!

স্থলা হুঁ-বলার আগেই কুকুর ডেকে উঠল সামনে। তারপর ঝোপঝাড় মাড়িয়ে একটা ছুটোছুটির শব্দ। মদ্দা শেয়ালগুলিকে এই মরসুমে একদম বিশ্বাস করা যায় না, কুকুরগুলিকে তো নয়ই! শোয়াল-কুকুরের জার জন্মাবে এক গাদা।

চারিদিক থেকেই কুকুর ডাকতে লাগল। সামনে, পিছনে, কাছে ও দূরে।

তিনটে গুদাম ঘর পার হয় ওরা। প্রতিটি উঁচু-নিচু, পথের প্রতিটি গাছ, ঝোপঝাড় প্রায় অঙ্কের মতো চেনা ও মাপজোক করা আছে।

স্থলা বলল, বিষ্টি লাইম্‌বে মনে লয়।

বটা জবাব দিল, দেরি আছে। লোনা বাতাসে এখনো উড়ুয়ে নেচ্ছে। বাতাসটা জল জল।

স্থলা বলে, হাঁকডাকও তো খুব।

ম্যাগের ?

হ্যাঁ। আবার বিজলি নাকি চমকায়।

হুঁ, মানুষে কয়, বিজলি চমকায়। কেমন কইরে চমকায় ?

কি জানি! মানুষে ছাখে ? বোধায়, মন যে রকোম চমকায়, সেই রকোমই হবি।

বটা হাসে, বলে, মনের মতন চমকায় ?

স্থলাও হাসে। হিঃ হিঃ হিঃ!—আবার বলে, সব কিছুর নাকি রঙ আছে।

হ্যাঁ, মানুষে ছাখে। লাল, সইবজে, লীল, শাদা···

আর কালা ? কালাটা কেমন ?

আন্ধারের মতন।

আন্ধার ?

হ্যাঁ, মানুষে কয়।

লোকে বলে, অন্ধকারটা কালো। ওরা কালো চেনে না, শাদা চেনে না। লাল চেনে না, নীল চেনে না।

স্থলা বলে, পয়সা নাকি নাল আর শাদা।

বটা বলে, শুঁইকলে মালুম দেয়, কোনটা নাল আর শাদা। নালটার গন্ধ ঘামের মতন। শাদাটার গন্ধ নাই।

হুঁ। হাত দিলিও ট্যার পাওয়া যায়।

তা তো যায়ই।

গন্তব্যে এসে দাঁড়ায় দুজনে। স্থলা বলে, এই ছাখো শালারা এইসে জুইটেছে। হুট্, হুট্!

গোটা কয়েক কুকুর, ঘেউ ঘেউ করছে না কিন্তু গায়ে পড়াপড়ি, দাপাদাপি করে গর্‌গর্ করছে। তাড়া খেয়ে দৌড়ে পালাল।

ওরা দুজনে, লাঠি ঠুকে ঠুকে একটা কোণ-বরাবর চলে যায়। সেখানে পাতা চাটাইয়ের ওপর শুয়ে পড়ে দু'জনেই।

আঃ!

আর একজন কাশে। তারপর দুজনেই তলপেটের কাছে হাত নিয়ে যায়। খরচ শেষে অবশিষ্ট পয়সা টিপে টিপে দেখে।

কোন্ গুদামঘরের চালের টিনের জোড় খুলে গেছে। বাতাসে টিনটা ঘা খেয়ে খেয়ে মেঘ ডাকার সঙ্গে তাল রাখছে মাঝে মাঝে। বটা ডাকল, সুলা ব্যালাইগুা।

হুঁ।

রাইত-ব্যালাইগুা ডাকে না যে?

তাই ভাবতেছি।

সুলার কথা শেষ হবার আগেই পাখিটা ডেকে উঠল, পিক্ পিক্ পিকু পিকু!

বটা বলে উঠল, ওই, ওই, ডাক ছেইড়েছে রাইত-কানাটা।

কোথায় একটা কাঠের ফ্রেমের কানাচে বাসা বেঁধেছে পাখি। ওরা যখন আসে, দু'চারটে কথা বলে, তখন পাখিটা ডেকে ওঠে। ভয়ে ডেকে ওঠে শিস্ দিয়ে, পিক্ পিক্ পিকু পিকু। সাবধান। মানুষ এসেছে।

সুলা বলে, বড় তাজ্জব, না?

কেন?

দিনে নাকি দেইখতে পায়, রাইতে ব্যালাইগুা।

হুঁ! মান্ষে কয়। তাই ডরায়।

কেন?

মান্ষেরে নাকি ডরায়, মান্ষে কয়। কুত্তারে ডরায় না, গরুরে ডরায় না, মান্ষেরে ডরায়। ডিম নাকি পাড়ছে, বাচ্চা ফুইটবে, তাই ডরায়।

আবার ডেকে উঠল পাখিটা।

সুলা বলে, ডিম সামলায়। কিন্তুস্ ছাখে কেমন কইরে?

আন্দাজে সামলায়। দিনের বেলা দেইখতে পায়।
জম্মো-কানা লয়।

হুঁ! চোইখ আছে, রং চেনে, উইড়তে পারে।

একটু চুপচাপ। পাখিটা প্রতিদিনের অভ্যাসের মতো নির্ভয় হয়, শান্ত হয়। চুপ করে করে থাকে। বৃষ্টি আসে নি, ঘটা আরো ঘোর হয়েছে তবু জোড়-খোলা টিনটা শব্দ করছে তেমনি।

সুলা বলে, পাখি কোনোদিন দেখি নাই।

অর্থাৎ স্পর্শ করে নি কোনোদিন।

বটা বলে, মান্ষে ছাখে, কয়, দুইটা নাকি পা, আর দুইখান পাখা।

পাখা কেমন?

কি জানি! খুব নাকি নরম জীব। নদীর ওপার নাকি যায় উইড়ে উইড়ে, আবার এইসে পড়ে।

হ্যাঁ, মান্‌ষে তো কয়।

ডিম ফুইটে নাকি বাচ্চা বারোয়?

মান্‌ষে কয়।

মান্‌ষের শুধু বাচ্চা হয়। কেমন কইরে হয়?

স্থলা চুপ করে থাকে। গুদামের গুহায় ঢুকে পড়া বাতাস বেরুবার জন্য ছটফট করে। তার ঘষা মণি দুটি স্থির হয়ে থাকে এক জায়গায়।

বটার পটকার মতো ড্যালা দুটি কাঁপে তিরতির করে।

স্থলা হঠাৎ বলে, মান্‌ষে কয় না?

তারপর ওদের অন্ধ চোখে ঘুম নামে। ঘটনার আগের দিন ঘুমোয় দুজনে।

ইতিহাসের আগে, আদিম যুগের গুহা-মানবের মতো নিতান্ত গোষ্ঠিবদ্ধ দুটি জীব। শব্দ দিয়ে যারা রূপকে দেখতে চেয়েছে, স্পর্শ করে রঙকে চিনতে চেয়েছে। কীট আর পতঙ্গের চেয়েও যেন অসহায়। ক্ষুধার মতো প্রাকৃতিক বোধ আর অসুখের অনুভূতি ছাড়া, মানুষ হিসেবে আর কোনো দরকার নেই তাদের।

কোনো হিংস্রতা নেই, ইতিহাসের আলোক তাদের অজ্ঞানতার অন্ধকারে বাতি জ্বালে নি।

কারণ, পৃথিবীতে তারা এসেছে, পৃথিবীর কিছুই তারা দেখে নি। মানুষের মধ্যে বাস করেও কিছু দেখে নি তারা মানুষের।

তবু ইতিহাস তাদের অন্ধ বুকে এসে মাঝে মাঝে দোলা দিয়ে গেছে। পাখি-রঙ-মানুষের বিষয় তারা ভাবতে চেয়েছে।

কিন্তু ইতিহাসের অকৃত্রিম বোধগুলি অচেনা থেকে গেছে তাদের। রাজ্যজয়, ভোগ, দখল, দাবি, ক্ষমতা, অধিকার আর হিংসা তাদের ইতিহাসের দাগের বাইরে রেখে দিয়েছে। ইতিহাস কোনোদিন তাদের সেই টুটিটা খুলে দেয় নি, যেখান থেকে সে চিৎকার করে উঠবে, আমার! এটা আমার, ওটা আমার, আমি চাই। তাই দেড়ো-ব্যালাইগুা বটা আর স্থলা ব্যালাইগুা অনৈতিহাসিক আদিম ভীরু অসহায় অন্ধকারে পড়ে আছে।

তবু ইতিহাস সেখানেও ছায়া ফেলে গেছে মাঝে মাঝে। যেমন,

কুকুরের সঙ্গে ওরা শোয় নি, নিজেদের আস্তানা থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। ভয় হয়, কেউ ওদের ভিক্ষের কড়ি মেরে কেড়ে নেবে কি না। খাবার নিয়ে ওদের পরস্পরের মধ্যে ঝগড়া হয়েছে।—কিন্তু সে ঝগড়া ওদের বেশিক্ষণ টেকেনি। যুগযুগান্ত ধরে পাশাপাশি দুটি রাজ্যের হত্যা ও বিদ্বেষের মতো ঐতিহাসিক হয়ে ওঠা সম্ভব হয়নি ওদের, কারণ, পরদিন ওরা আবার খেতে পেয়েছে, কারুর ভাগে কম পড়ে নি। তখন ওরা আবার একত্র হয়েছে, কেননা, দুজনের অন্ধ-সমাজে আর কেউ নেই। সাধারণ মানুষের মতো সাধারণভাবে ভালোবাসাবাসি করেছে। বলাবলি করেছে, ভাত নাকি শাদা।

হ্যাঁ, মান্‌ষে কয়। ওইটা শাদার গন্ধ।

দুধ নাকি শাদা।

মান্‌ষে কয়। দুধেরো গন্ধ শাদা।

আমি দুধ খেইছি, তিন বার।

আমি একবার।

মায়ের দুধ নাকি শাদা?

মান্‌ষে কয়। আমার মনে নাই।

আমারো না।

তারপর ওরা চুপ হয়ে গেছে। চুপ হয়ে, অনেক দূর পিছিয়ে গেছে অন্ধকারে অন্ধকারে। কল্পনা করার চেষ্টা করেছে, একটা মা-কে। একটি মা, নিশ্চয় সে ওদেরই মতো ছিল। একটা মাথা, দুটো হাত, দুটো পা। আর মানুষের মতো চোখ, যা দিয়ে দেখা যায়। কিন্তু দুধ? দুধ কোথায় ছিল। বুকে নাকি থাকত। বুকে? বুকের কোথায়?

যেন মা ঘুমোয় অঘোরে আর তার পাশে দিশেহারা সদ্যোজাত ছেলে বিস্ময় হাতড়ে ফেরে, দুধ, দুধ কোথায়।

দেড়ো-ব্যালাইণ্ডা বটা চিৎকার করে গান ধরে দিয়েছে, যে গান গেয়ে সে ভিক্ষে করে:

হে ভগমান! ভগমা—ন!
অন্ধজনে কর কর ত্রাণ।

স্থূলা ব্যালাইণ্ডা ঘাড় নেড়ে বলেছে, হ্যাঁ! মা দেখি নাই বাবা, বাবা দেখি নাই বাবা, হেই মা-বাবা···

তারপর অন্ধত্ব ঘোচাবার জন্যেই যেন ওরা, গায়ে গা-ঠেকিয়ে শুয়ে

থেকেছে। তখন বোধহয় শুধু মহাকালই চোখ মেলে তাকিয়েছিল, যে ওদের আয়ুষ্কালের শেষ দিগন্তে দেখছিল ত্রাণের নিঃশব্দ দিনটাকে।

ওরা দুজনে ঘুমিয়ে পড়ল, বৃষ্টিটা তখনো এল না। পূবে ভারি বাতাস আরো ভারি হয়ে উঠল। শুধু বিদ্যুৎ হানাহানি, মেঘ ডাকাডাকি এল কমে। প্রকৃতি যেন এবার চুপি চুপি কিছু সারবার তালে আছে। কারণ রাত্রিটা অন্ধ। রাত পোহালে দেখা গেল বৃষ্টি হয় নি। কিন্তু মেঘ কাটে নি।

সুলা আর বটা শুয়ে শুয়ে শুনতে পেল, কলকাতার বাস চলে যাচ্ছে। এ সময়টা ভিক্ষে পাওয়া যায় না বড় একটা। সেইজন্য ভোরের দিকে কয়েকটা বাস ওরা রোজই ছেড়ে দেয়।

সুলা বলে, রৌদ ওঠে নাই।

বটা জবাব দেয়, ম্যাঘ আছে আকাশে।

লাঠি ঠুকে ঠুকে, চেনা পথে বাজারের কাছে আসে দুজনেই।

একটু পরেই দূর থেকে আপ-গাড়ীর শব্দ ভেসে আসে।

সুলা বলে, সুলা ব্যালাইণ্ডারে ডাইকতে ডাইকতে আইসতেছে।

বটা বলে, তোর মুণ্ডু। ওই শোন দেড়ো-ব্যালাইণ্ডার নাম করতিছে।

অর্থাৎ, গাড়ির এঞ্জিন নাকি ওদের নাম ধরে ডাকতে ডাকতে আসে। গূঢ়ার্থ হল, ওদের ভিক্ষে পাওয়ার ভাগ্য নিয়ে একটু খুনসুটি।

তা ছাড়া, এঞ্জিনের শব্দটা ওদের কাছে শুধু একটি যান্ত্রিক শব্দমাত্রই নয়। আরো কিছু। রহস্য-ঘেরা এক বিচিত্র আত্মার মতো, যার মধ্যে ওরা অনুভব করেছে ভয়ঙ্করের ভয়, ভরসার বন্ধু। মানুষ যেমন অলৌকিকের সঙ্গে সম্বন্ধ পাতিয়ে সত্যমিথ্যের নানান খেলা করে, এঞ্জিনের শব্দটার সঙ্গে ওদের তেমনি একটি অলৌকিক সম্পর্ক উঠেছে গড়ে। পেট্রল কিংবা ডিজেলের গন্ধের মধ্যে তাকে ওরা আবিষ্কার করেছে ভয়ঙ্কর ও মহতের মতো একটা কিছু।

গাড়িটা আসে। পরস্পরের চুক্তি অনুযায়ী দু'জনে দাঁড়িয়ে যায় গাড়িটার দু-পাশে। বটা আর সুলা সবে চিৎকার করতে যাবে, এমন সময় সেই শব্দটা শোনা গেল। ঘটনার সূত্রপাত হল। দু'জনে ওরা দাঁড়িয়ে রইল স্তম্ভিত হয়ে।

ওরা স্তম্ভিত হল, কিন্তু চা ও খাবারওয়ালার চিৎকার চলতে লাগল সমানে। চলতে লাগল যাত্রীর ওঠা-নামা, হাঁকডাক। কোথাও কোনো বিস্ময় নেই; আর কেউ স্তম্ভিত হয় নি। বাতাস ঠিক বইছে, আকাশ ঠিক

মেঘলা আছে। বাজারের স্তিমিত কলরব শোনা যাচ্ছে ঠিক, ঠিক শোনা যাচ্ছে ইছামতীর খেয়া-মাঝির হাঁক।

কেবল দেড়ো-ব্যালাইগুার আর স্থলা ব্যালাইগুার ঘষা চোখের মনি স্থির, মাছের পটকা-ড্যালার টুকুস্‌টুকুস্ লাফানি।

শুধু মহাকাল দেখল, অন্ধ ও আদিম জগতের একত্র বাস-গুহায় নতুন কালের আবির্ভাব হল। পদক্ষেপ করছে ইতিহাস।

বটা-স্থলা নয়, বাসের সামনে দাঁড়িয়ে চিৎকার করছে একটি মেয়েমানুষ: দু'একখান পয়সা দিয়ে যান গো বাবা, জন্মান্ধ বাবা। সোয়ামী-পুত্তুর নেই, দেখবার কেউ নেই, আপনেদের দয়া। বলতে বলতে গান ধরে দিল:

ঠাকুর, কতকাল আর রাখবে নজর কেড়ে,
কবে জনম সাথক হবে, তোমারে হেরে।

স্থলা ঘুরে এসে বটার সামনে দাঁড়াল।

স্থলা?

হুঁ।

আর এ্যাটটা জুইটল?

ব্যালাইগুানি।

চইমকে গেছি।

বিজলির মতন।

জন্মান্ধ কয়।

মান্‌ষে দেইখবে।

বটা স্থলার দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, রাগারাগি করিস্ না ঝ্যানো।

স্থলা বলল, দরদ আইসে না।

বটা প্রায় চাপা-গলায় হাম্‌লে উঠল, মাগ্, মাগ্ তাড়াতাড়ি স্থলা, বলে সে নিজেই চিৎকার করে উঠল:

ভগমান! ভগমান!
অন্ধজনে কর ত্রাণ।

স্থলার ভিক্ষে চাওয়ার রীতি একটু আলাদা। সে গাড়িতে উঠে নানানরকম শব্দ করে। বেড়াল ডাকে, কুকুর ডাকে, কোকিল ডাকে। তারপর বলে, স্থলা ব্যালাইগুারে দ্যান কিছু।

লোকে হাসে, খুশি হয়। যার সামর্থ্য থাকে, সে দেয় কিছু।

কিন্তু আজকে মনোযোগ দিতে পারল না স্থলা।

ওদের দুজনের চিৎকার শুনে, মেয়ে-গলাটা স্তিমিত হয়ে এসেছে একটু। বুঝতে পারল, বিনা-ভাগের নিরঙ্কুশ রাজ্যে সে প্রবেশ করে নি।

গাড়িটা চলে যায়। সুলা আর বটা দাঁড়ায় পাশাপাশি। টের পায়, ভাগিদার পিছনেই দাঁড়িয়ে আছে।

তাই দাঁড়িয়ে ছিল। নাম ওর—কানী কুরচি। এসেছে কলকাতার শহরতলী থেকে। চোখ বলে ওর কিছু নেই, দুটি অস্পষ্ট অন্ধকার গর্ত, চোপ্‌সানো দুটি চোখের পাতা পিটপিট করে তার ওপর। বয়সের দাগ পড়েছে সারা গায়ে। সেটা বয়সেরই কিংবা শুধু এই জীবনের দাগ, অনুমান করা যায় না। সে জন্যে বয়সটা তার গৌণ। তিরিশ হতে পারে, পঞ্চাশও হতে পারে। যৌবনের কোনো চিহ্ন নেই, কিন্তু মেয়েমানুষের চিহ্নটুকু আছে সর্বাঙ্গে।—শনমুড়ি চুলে, জন্মান্ধের ছাপমারা মুখে, সেই প্রথম সন্ধিক্ষণের বেড়ে-উঠে থম্‌কে-যাওয়া শরীরে বয়সের বহুল রেখায়।

কুরচিও থম্‌কে আছে, টের পেয়েছে দুজনের দাঁড়িয়ে থাকা। মুখের ওপর তার শন-পাঁশুটে চুল পড়েছে উড়ে। মুখে একটু তোষামোদের হাসি।

বলে, ক'জনা হে?

বটা-সুলাকে জিজ্ঞেস করছে, মোট ক'জনা অন্ধ আছে।

সুলা উল্টোমুখে হাঁটা ধরে লাঠি ঠুকে ঠুকে। বটাও। কুরচি হাসিটুকু বিকৃত করে, মুখ ফিরিয়ে থাকে ওদের লাঠি-ঠোকার শব্দের দিকে। আপন মনে বলে, ঝগড়া করতে চায়। তারপর সেও অন্যদিকে যায় লাঠি ঠুকে ঠুকে।

সুলা আর বটা গিয়ে বসে একটি চালের আড়তের সামনে গাছতলায়। ভিক্ষে করে। ওইটি ওদের বসার জায়গা।

বটা বলে, আর এ্যাট্টা কানা ছাওয়াল জুইটছিল একবার, মইরে গেছে।

সুলা বলে, এইটাও মরবে।

রাগ করিস না সুলা।

দরদ আইসে না।

আপনে আপনিই পলাইবে।

একটু চুপচাপ। সুলা বলে, ভাগিদার।

বটা বলে, মান্‌ষে কিছু কয় না?

মানুষে কিছু না বললে, ওদের বলার হক নেই! এই বাজারের এক মহাজনের খদ্দের আর-এক মহাজন ভাঙিয়ে নিলে মারামারি হয়, পঞ্চায়েতের

বিচার হয়। কিন্তু কানী কুরচির ব্যাপারে সকলে নির্বিকার। পৃথিবীর কোথাও কিছু যায়-আসে না।

স্থলা বলে, মেইয়েমানুষ।

দেখি নাই কোনো দিন।

অর্থাৎ স্পর্শ করে নি।

ব্যালাইগুানি।

মানুষে ছাখে।

এয়াদের ছাওয়াল হয়।

ছুধ হয়।

চুপ করে ওরা। আবার গাড়ি আসে। ভিক্ষে করে ওরা। বরং কানী কুরচিই আসর জমাতে পারে না! সময় লাগবে।

প্রত্যেকবার গাড়ি আসে, গাড়ি যায়। কানী কুরচি প্রত্যেকবারই খোসামোদ করে হাসে। ব্যালাইগুারা চুপচাপ গাছতলায় চলে যায়।

কানী কুরচি বলে আপন মনে, ভাগাতে চায় আমারে। কানারে দয়া করতে চায় না। ছু'দিন কাটল এমনি। বাজারের কেউ কেউ একটু-আধটু বলাবলি করল ওদের ছুজনের সামনে, আর একটা কানী এসে জুটেছে।

ছুই কানা এক কানী হল।

মেঘ কাটেনি ছু'দিন। তিন দিনের দিন রাত পোহাতেই প্রবল বৃষ্টি এল। স্থলা আর বটা বেরোয়নি। বসেছিল গুদাম-ঘরটার অন্ধকার কোণে।

টিনের চালে বৃষ্টির শব্দ বেশি হয়। চুপচাপ বসে সেই শব্দ শুনছে ছুজনে। মাঝে মাঝে মেঘের গর্জন শোনা যায়। মনে হয়, চালের টিনের ওপর কেউ বাঁশ পিটছে থেকে থেকে।

পাখিটা বেরুতে পারে নি। বোধহয় ছুটি পাখি থাকে। কখনো কখনো সেই রকম মনে হয় বটা-স্থলার। যেন ছু'জনে কথাবার্তা বলে। এখন একলা আছে পাখিটা নিশ্চয়। মেঘের গর্জন শুনলে ডেকে ওঠে একবার, পিক।

বটা-স্থলা ছুজনেই গুদামের দরজার দিকে মুখ তুলল। শব্দ হল যেন কিসের?

পাখিটা মহাকালের হয়ে যেন ভয়-চাপা গলায় ডেকে উঠল, পিক পিক পিকর্‌র্‌র্ পিকর্‌র্‌র্। ব্যালাইগুারা, ছাখ কে এসেছে।

জলে ভিজে প্রায় কাঁপতে কাঁপতে বলল কানী কুরচি, বাবারে বাবা, কী বিষ্টি! সম্‌সারটা ধুয়ে নিয়ে যাবে গো।

কে ?

বটা জিজ্ঞেস করল।

কুরচি একটু চমকে উঠল। শব্দ-আসা কোণটার দিকে মুখ করে বলল, কানী কুরচি গো বাবু! হেই বাবা, কারুর ঘরে ঢুকে পড়িনি তো!

কোনো জবাব নেই। পাখিটা ডানা ঝাপটে আবার ডাকল, পিকর্‌র্‌র্ পিকর্‌র্‌র্! সে এসেছে, সে এসেছে। পিকু পিকু পিকৃচ্‌ পিকৃচ্‌! ব্যালাইওারা মহাকাল তোদের নতুন পথের মোড়ে এনেছে।

কানী কুরচির চোখের অন্ধকারে সন্দেহ ও কৌতূহলের ঝিকিমিকি। কোণ লক্ষ্য করে এক-পা দু'পা করে এগুতে এগুতে বলল, সেই দু'জনা নাকি হে ভাই!

স্থলা আর বটা দুজনে নিঃশব্দে নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে যেন কথা বলে ঃ

ব্যালাইওানি ?

হুঁ। কি চায় ?

স্থলা জিজ্ঞেস করে মুখ ফুটে, কি চাই ?

কুরচি এগুতে লাগল।—এ্যাট্‌টা ডেরা—ডাওা খুঁজছি। সবাই এদিকটা দেখিয়ে দিলে, বললে, মেলাই খালি গুদোম-ঘর নাকি পড়ে আছে। তা দরজাই খুঁজে পাই না। তা পরে এখেনটায় এসে মনে হল, গুদোম-ঘরের দরজা নেইকো।

মেঘ ডাকল। একটা দমকা বাতাস এক রাশ জল নিয়ে গুদামঘরের অনেকখানি ভিজিয়ে দিয়ে গেল।

কুরচি কেঁপে উঠে বলে, আ মা গো, জাড় লেগে গেল। গায়ের চামড়া থিকৃথিকে কাদার মতো নাগছে। তারপর হঠাৎ বলে ওঠে, তোমরা বাপু আমার পরে খুব গোঁসা করে আছ, না!

কানী কুরচির গলায় যেন সোহাগ-মাখা অভিমান।

দুই ব্যালাইওার যেন নিঃশ্বাস আটকে যায় বুকে। কি হল ? কি যেন ঘটে গেল গুদাম-ঘরটার মধ্যে ? মানুষ কি একেই মায়া বলে ? যেন কিসের মায়া ছড়িয়ে পড়ল ঘরটার মধ্যে।

মহাকাল দেখছিল, গুদামঘরে নয়, একটি মানুষিক মায়া এতদিনে ব্যালাইওাদের অনুভূতিতে প্রবেশ করেছে। মেয়ে-গলায় সোহাগী অভিমানের সুরে, কেমন যেন করে ওঠে বুকের মধ্যে। চমকে চমকে ওঠে। বিজলির মতন কি না কে জানে।

স্থলার নিঃশ্বাস পড়ে বটার গায়ে, বটার নিঃশ্বাস স্থলার গায়ে। নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে নিঃশব্দে কথা বলে দু'জনে :

মেইয়েমানুষ।

দেখি নাই কোনোদিন।

ব্যালাইণ্ডানি।

মান্‌ষে দ্যাখে।

বটা বলে মুখ ফুটে, না গোঁসার কি আর আছে।

স্থলা বলে, হ্যাঁ, তুমোও যা আমুও তা। হক্ আছে তোমার ভিক্কে কইরবার।

কানী কুরচির মুখে হাসি ফোটে। পুরুষের স্তুতি শোনা-মেয়েমানুষের হাসি। যেন ঠোঁট ফুলিয়ে বলে, পেত্থম পেত্থম গোঁসা করেছিলে, জবাব করনি কো। মনে বড় দুঃখু নেগেছিল।

বড় দুঃখ পেয়েছিল কানী কুরচি।

এখন শুনে বড় দুঃখ পায় ব্যালাইণ্ডারা। কানী কুরচির ঠোঁট-ফোলানো সোহাগের সুরে জন্মান্ধ বুক বড় টনটনিয়ে ওঠে। মনে মনে কথা বলে দু'জনে :

মেইয়েমানুষ।

দেখি নাই কোনোদিন।

কাছে আইসতে চায়।

বুকটা বড় টাটায়।

স্থলা আর বটা হাসতে চেষ্টা করে। অভিমানাহত মেয়েমানুষের কাছে আত্মসমর্পিত পুরুষের বিব্রত হাসি।

স্থলা বলে মুখ ফুটে, দুঃখু পেয়ো না। আমরা কানা।

বটা বলে, হ্যাঁ, জম্মো-কানা। ব্যালাইণ্ডা।

কানী কুরচি তখন দুজনের একেবারে সামনে। তার হাতের লাঠি স্পর্শ করেছে দুজনের পায়ে।

অবাক হয়ে বলল, কী বললে?

ব্যালাইণ্ডা।

ব্যালাইণ্ডা?

হ্যাঁ, কানারে ইঞ্জিরিতে তাই বলে।

বলে স্থলা হেসে ওঠে, হিঃ হিঃ হিঃ···।

বটা হাসে, হেঃ হেঃ হেঃ··· ।

কানী কুরচি ওদের গা ঘেঁষে বসে। মোটা গলার হাসির স্বরে একটি মেয়ে গলার খুশির হাসি চড়া স্বরে বেজে ওঠে বাজনার মতো।

পাখিটা ডেকে উঠল, পিক্! কি হল? পরমূহূর্তেই ডেকে উঠল গলা ফাটিয়ে, ক্যা—ক্যা—ক্যা, পিচ্‌কা পিচ্‌কা। কী মজা! কী মজা! মহাকাল একটা সুখী সংসার করে দিল গুদামঘরের মধ্যে।

অঝোরে বৃষ্টি ঝরছে। টিনের ওপর বৃষ্টি পড়ছে, বাজছে একটানা, ঝম্ ঝম্ ঝম্ ঝম্। সেই শব্দে তাল রেখে তিনজনে কথা বলে। পরস্পরের পরিচয় পাড়া হয়। কে কোথা থেকে এসেছে কোথায় কার ঘর ছিল।

তিনজনে বলে তাদের জীবনবৃত্তান্ত, একটানা গোঙানির মতো। যেন কোনো এক বিস্মৃতকালের অতীত থেকে তারা এতদূর এসে পৌঁছেছে।

কানী কুরচির অনেক অভিজ্ঞতা। অনেক দেশবিদেশ সে ঘুরে এসেছে রেলগাড়িতে করে, মানুষের কত রকম কথা সে শুনেছে। সে সব 'ইঞ্জিরি'র চেয়েও অদ্ভুত কথা। কুরচি বলে। বটা-সুলা সায় দেয়, মান্‌ষে কইত।

অর্থাৎ, এতদিন লোকে বলত, এবার একটা ব্যালাইওানি বলছে।

কুরচি বলে, কলকাতার কথা। আ! কী রাস্তা গো। পায়ের তলায় যেন পাকা ঘরের মেঝে। মনে হত হাত দিয়ে ধুলো ঝেড়ে দিই রাস্তার।

হ্যাঁ, মান্‌ষে কইত।

বটা-সুলা কথা শোনে আর নাকের পাটা ওদের ফুলে ফুলে ওঠে। গন্ধ নেয়, নতুন গন্ধ, ব্যালাইওানির গায়ের গন্ধ লাগে তাদের নাকে। এর আগে ওরা অনেক ভালো গন্ধ পেয়েছে। বাজারের কলা, কুল, তরি-তরকারি আর ফুলের গন্ধ। সে গন্ধ তাদের ভালো লেগেছে। কিন্তু ব্যালাইওানির গায়ের গন্ধ তাদের কেমন যেন নেশা ধরিয়ে দেয়। এদিক-ওদিক করতে গিয়ে ছোঁয়াছুয়ি হয়।

পাখিটা দুষ্টুমির স্বরে যেন ডাকে, পিক? কি হল?

কি হচ্ছে, ব্যালাইওারা তা বুঝতে পারে না। শুধু বুঝতে পারে, ওদের অন্ধ রক্তে কিসের মোচড় লাগছে। ওরা যেন কি দেখতে পায়। তবু ওরা হতভম্ব। গোষ্ঠিবদ্ধ দুটি গুহাবাসীকে যেন কে ধরে এনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে আকাশের তলায়, বাতাস আর গন্ধের মাঝখানে। এবার কোনদিকে যেতে হবে? রাস্তার কোনদিকে? ওদের যাত্রা শুরু হয়েছে, ব্যালাইওারী পথ চায়। মনে মনে কথা বলে ওরা:

দেড়ো ব্যালাইণ্ডা, আমার মন বড় আঁকপাকু করে।

স্থলা ব্যালাইণ্ডা, আমার মন ঝ্যানে কান্দে।

এইটে সুখ না দুঃখু?

মান্ষে জানে।

কুরচি একরাশ ভেজা চিঁড়েমুড়ি, ভেলি গুড় আর মৌমাছির দলা-পাকানো মিষ্টি বের করে কোঁচর থেকে। বলে, আজ আর ভিখ মাগা হবে না। এইস খাই।

তিন জনে হাত বাড়িয়ে খায়।

বিদ্যুৎ চমকায়, মেঘ ডাকে, বৃষ্টি পড়ে অঝোরে। ভেজা বাতাসে শিউরে শিউরে ওঠে গায়ের লোমকূপ। ব্যালাইণ্ডাদের পেটের খিদের জোর নেই, মন তাদের আন্চান্ করে। এই বর্ষায়, মাতাল পুরুষ ব্যাঙ-এর মতো ডাকতে ইচ্ছে করে, ক্যাঁ-কোঁ, ক্যাঁ-কো। যেমন করে মেয়ে-বাঙাটাকে সে ডাকে।

কুরচির হাত উঠে যায় বটার গায়ে। বৃষ্টির মত ঝিম্‌ঝিম্-স্বরে বলে, দেখি এট্‌টু তোমাদের। অ, দাড়ি আছে তোমার?

বটা বলে, মান্ষে ছাখে।

স্থলার ঘষা মণি দুটি স্থির। বেঁটে খাটো কালো শক্ত শরীরটা যেন পাথরের মূর্তির মতো। তার স্তব্ধ পেশী ও রক্তকোষে কে যেন শব্দহীন চিৎকার করে।

কুরচির একটা হাত উঠে আসে স্থলার গায়ে। প্রতি রক্তবিন্দুতে সে-স্পর্শ অনুভব করে স্থলা। কুরচি বলে, তোমার দাড়ি নেই গোঁফ আছে।

স্থলা বলে, মান্ষে ছাখে।

মাছের পটকার মতো বটার চোখের ড্যালা কাঁপে তিরতিরিয়ে। তার বুকের মধ্যে যেন একটি চোখ-ধাঁধানো অন্ধ চিৎকার করে, আমার গায়ে—আমার গায়ে একটুখানি হাত দাও ব্যালাইণ্ডানি।

লাঠি-ধরা কড়া-পড়া শক্ত শক্ত দু'হাতে দু'জনেরই গায়ে হাত রাখে কানী কুরচি। বুলোয়।

সকাল গেছে, দুপুর গেছে, এবার বুঝি বিকেলও গড়ায়। বৃষ্টি কখনো ধরব-ধরব করছে, ফিস্‌ফিস্ করে ঝরেছে, আবার এসেছে মুষলধারে। থামে নি।

কানী কুরচি দু'জনের মাঝখানে জায়গা করে নেয়।

তারপরে মহাকালের ইঙ্গিতে বটা-স্থলার হাত উঠে আসে কুরচির গায়ে।

ওদের বুকের ভিতর থেকে কিসের একটি প্রচণ্ড স্রোত নামতে লাগল কল্‌কল্‌ করে। যেন অন্ধকার গুহা থেকে একটি তীব্র স্রোতধারা, ভয়ঙ্কর প্লাবনের মতো ভাসিয়ে নিয়ে চলল অনেক দেশ, নদনদী, অরণ্য।

কুরচি হাসে খিল্‌খিল্‌ করে। ব্যালাইগুাদের হাত তার শরীরে ঘুরে বেড়ায়। কানী কুরচি হাসে বৃষ্টির মতো ঝিরঝির করে।

তারপর কুরচির গা বেয়ে, স্থলা আর বটার হাতে হাত ঠেকে যায়। এক মুহূর্তের জন্যে থেমে যায় হাত দুটি। মনে মনে কথা বলে দুজনে:

স্থলা ব্যালাইগুা, বড় সুখ লাগে।

বড় সুখ লাগে।

মনটা পাগল-পাগল করে।

আমারো করে।

কেন করে?

মান্‌ষে জানে।

কানী কুরচি মাতালের মতো হাসে।

পাখিটা ডাকে গলা ফুলিয়ে, পিক্‌ পিক্‌চা! মদ্দা পাখির মতো কথা বলে ব্যালাইগুারা।

কুরচির গা বেয়ে বেয়ে আবার হাতে হাত ঠেকে যায় বটা-স্থলার। এক মুহূর্ত। আবার সরিয়ে নেয়। আবার ঠেকে; আবার সরায়।

রুদ্ধশ্বাস, অপলক চোখ শুধু মহাকালের।

আবার ঠেকে যায়, আবার সরায়।

তারপর আবার ঠেকল। আর সেই মুহূর্তে একটা হাত আর-একটা হাতকে মুচড়ে, ঝটকা মেরে সরিয়ে দিল।

পলকের স্তব্ধতা। আর একটি হাত কুরচিকে ডিঙিয়ে ঠাস করে মারল আর-একজনকে।

শালা কানা।

কানার বাচ্চা কানা।

কুরচি লাফ দিয়ে উঠে বসে দুজনের মাঝখানে: গ্যাখ গ্যাখ কী কাণ্ড। এই ধুকপুকুনি আমার মনে ছিল গো, এই ধুকপুকুনি আমার মনে ছিল।

পাখিটা ডেকে উঠল, পিক্‌চ পিক্‌চ, পিকর্‌র্‌র্‌। হেই গো মহাকাল! এই ভয় আমার মনে ছিল, কানা দুটো ছকের মধ্যে ঘুরবে আর লড়বে।

কুরচি বলে দুজনের গায়ে দুটি হাত রেখে, এই আমি দেখলাম জীবনভর। কী চোখওলা আর কী অন্ধ, সবাই এক। সবাই আমার কাছে এসেছে, সবাই লড়েছে।

দুই ব্যালাইগুা কুরচির দু'পাশে, মাথা নিচু করে বসে থাকে। দেখে মনে হয় তারা লড়েনি, আর কেউ লড়েছে। তাদের ভাবলেশহীন মুখ দেখে মনে হয়, দুটি অনড় নিশ্চল পাথরের চাঁই।

কেবল মনে মনে বলে, আমরা ব্যালাইগুা। আমরা কানা। আমরা মানুষের মতন কইরতেছি।

কুরচি সোহাগী স্বরে অভিমান করে বলে, এই আমি জীবনভর দেখলাম। ভাগাভাগি চাস তোরা। তবে আমার হাত কেটে নে, পা কেটে নে, আমার শরীল কেটে নে।

ব্যালাইগুারা নীরব। ঘষা চোখের মণি আর মাছের পটকা ড্যালা নড়াচড়া করে। কুরচি দুজনের গায়ে হাত বুলোয়, ঠোঁট ফুলিয়ে বলে, আমাকে কেন ভাগ করিস্। আমি তো দুজনার কাছেই এসেছি, তোদের দুজনারে পাব বলে।—মাটি নয়, জল নয়, আকাশ নয় কুরচি। মেয়েমানুষ। কিন্তু কথা বলে অন্যরকম। যেন এই পৃথিবীর মানুষের মতো কথা নয়। যেন আর এক পৃথিবী থেকে এসেছে সে।

ব্যালাইগুারা মাথা নিচু করে বসে থাকে। কুরচি দুজনাকে কাছে টেনে বলে, আমরা ব্যালাইগুা, আয় শুয়ে পড়ি, রাত হয়ে আসছে।

পাখিটা ডেকে বলে, ফিক্ ফিক্ ফিকুর। ঠিক বলেছিস ব্যালাইগুানি।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে বুঝি কখন বৃষ্টি ধরেছিল একবার। আবার ঝরতে আরম্ভ করেছে। তবে মুষলধারে নয়, টিপ্ টিপ্ করে। বাতাসে ঝড়ের সংকেত। জোড়-খোলা টিনটা বড় বেশী গুম্‌গুম্ করছে।

বাজারের কোলাহল এখান থেকে সামান্যই শোনা যায়। আজ সারাদিনই প্রায় স্তব্ধতা গেছে। সারাদিন ডেকেছে শুধু কুকুরেরা। ইছামতীর জল ঘোলা হয়েছে। সেই ঘোলা জলে হিংস্র কামট ঘুরছে খাবারের সন্ধানে।

রুদ্ধশ্বাস মহাকাল এসে দাঁড়িয়েছে গুদামঘরের মধ্যে। স্থূলা আর বটার হাত ধরে তুলে এনেছে সে কুরচির গায়ে।

কুরচি হাসে নিস্তব্ধ মধ্যরাতের টিপ্ টিপ্ বর্ষার মতো। একবার এর দিকে ফেরে, আর একবার ওর দিকে।

আকাশ বৃষ্টি ঢালে কোটি কোটি বছর ধরে, তবু আগ্নেয়গিরি কোনোদিন নেভে না। গুদামের কোণে রক্তে রক্তে আগুন জ্বলছে দাউ দাউ করে।

আবার হাতে হাত ঠেকে যায়। দ্বিতীয়বারের অপেক্ষা থাকে না আর। আগের চেয়েও প্রচণ্ড বেগে, দুজনে আঘাত ও প্রত্যাঘাত করে কুরচিকে ডিঙিয়ে।

কুরচি চিৎকার করে উঠে বসে, থাম্। ওরে মরণেরা, আমার মরণেরা, তোরা থাম্, থাম্।

পাখিটা ডেকে ওঠে, পিকর্‌র্‌র্ পিকর্‌র্‌র্। মহাকাল! আমার ভয় করছে।

ব্যালাইগুরা থামে। থেমে হাঁপায় দুজনে। কিন্তু মনে মনে আর কথা বলে না। ভিতরে ভিতরে ওদের সমস্ত সন্ধি ভেঙে গেছে।

কুরচির আমন্ত্রণের অপেক্ষাও রাখতে চায় না দু'জনে আর। আবার হাত বাড়ায় দুজনে। আবার ধুপধাপ শব্দ হয় মারামারির।

কুরচি লাঠি নিয়ে উঠে দাঁড়ায়। দাঁতে দাঁত চেপে কেঁদে কেঁদে বলে, এমনি করে মরিস তোরা চেরদিন। তবে মর, তোরা মর, আমি চলে যাই। কুরচি লাঠি ঠুকে ঠুকে বৃষ্টির মধ্যে বেরিয়ে যায় বক্‌বক্ করতে করতে। লাঠি ঠুকে ঠুকে গিয়ে ওঠে রাস্তার ওপারের একটা গুদামে।

ব্যালাইগুা দুটো দাঁড়িয়ে থাকে স্তব্ধ হয়ে। কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর ব্যর্থ আক্রোশে স্থুলা বটাকে নিশানা করে হঠাৎ লাঠির খোঁচা মারে।

উঃ!

চাপা আর্তনাদের সঙ্গে সঙ্গে বটা সামনের দিকে লাঠি দিয়ে আঘাত করে। অব্যর্থ সন্ধান অন্ধের। আঘাত খেয়ে স্থুলা চীৎকার করে সরে যায়। বটাও সরে যায়।

তারপর দুজনেই নিঃশ্বাস চাপবার চেষ্টা করে হাঁপাতে থাকে।

পাখিটা চীৎকার ওঠে, পিক্‌চু পিক্‌চু, পিক্ পিক্, পিক্‌সা। মহাকাল, ওরা কানা, ওদের থামাও গো, থামাও।

মহাকাল মেঘস্বরে বলে তা হয় না। কাল নিরবধি, সে থামে না।

রাত পোহায়। বৃষ্টি থামে। ব্যালাইগুরা বেরোয় ভিক্ষে করতে ওদের অন্ধ চোখে মুখে কোথাও নতুন কোনো ছাপ চোখে পড়ে না সেই একই অসহায়, করুণ, অন্ধ দুটি মানুষ।

কলকাতার গাড়ি আসে। দু'জনে দু'পাশ থেকে চিৎকার করতে যায়। তার আগেই কানী কুরচির সরু গলা করুণ সুরে বেজে ওঠে।

কিছুক্ষণ থেমে যায় দু'জনেই। তারপর দুজনেই দু'দিক থেকে মাগ্‌তে শুরু করে। চিৎকার ক'রে মাগে বটা :

ভগবান!

অন্ধজনে কর ত্রাণ।

স্থলা বলে, এই বিড়ালটারে গ্যান, কুত্তাটারে গ্যান, শিয়ালটারে গ্যান, ব্যালাইগুারে গ্যান, হেই বাবা!

সারাদিন মাগে, দুজনে গাছতলায় যায়। কিন্তু কথা বলে না। ওদের কথা না-বলাটা লোকের চোখে পড়ে না একটুও। কারুর কোনো কৌতূহল নেই। কানী কুরচি শুধু ওদের কাছে পেলে অভিমান করে বলে ওঠে, তোদের কাছে যেতে গেলাম, তোরা আমারে তাড়িয়ে দিলি। তোরা কানা, তবু তোরা পাষাণ!

সারাদিন পরে বাজার ঝিমিয়ে আসে। ছ'টার সময় বাস বন্ধ হয়ে যায়। বাতি জ্বলে এদিকে-ওদিকে।

তিনটে লাঠিরই ঠুক্ ঠুক্ শব্দ গুদাম-ঘরগুলির দিকে এগিয়ে যায় বাজার থেকে। ঠুক্ ঠুক্—ঠুক্ ঠুক্—ঠুক্ ঠুক্। অনেকখানি দূরে দূরে ছাড়া-ছাড়া শব্দ। পাশাপাশি কেউ নয়।

সারাদিন বৃষ্টি হয় নি। দুপুরের দিকে রোদও উঠেছিল। এখন আকাশে ছড়ানো ছড়ানো মেঘ।

ইছামতীর জলে ভাঁটার ঢলের কল্‌কল্ শব্দ।

কুচরি থামে। স্থলা-বটার ঠুকঠুকুনিও থামে।

কুরচি চাপা মিষ্টি ব্যাকুলস্বরে বলে, কেন তোরা লড়িস্! তোরা ব্যালাইগুা, আমি তোদের দুজনকার, আমার কাছে আয়। তোদের মন যা চায়, আমার কাছে আছে। মন টাণ্ডা করে আয় আমার ঘরটায়। তোদের ঘরটায় আমি যাব না।

কুরচির কথায় যেন স্বপ্ন নামে। মোহাচ্ছন্ন করে রাত্রিটাকে। কানী একলা থাকতে চায় না।

কুরচি লাঠি ঠুকে ঠুকে যেতে যেতেও ডাকে, আয়, মরণ দুটো আয়।

ব্যালাইগুারা যুগপৎ লাঠি ঠুকে ঠুকে আর-একটা গুদামঘরে আসে।

কুরচি ডাকে, আয়, এই যে এদিকে, কাঠ পাতা আছে।

দু'জনে যায়, আস্তে আস্তে, অনেকখানি দূরত্ব রেখে।

আসছিস্? আয়, আয়।

কুরচি যেন খুশিতে হাসে চাপা গলায়। নাক-চোখ-মুখহীন দুটি বিচিত্র জীবের মতো ব্যালাইগুরা গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে কাছে এগোয় কুরচির। কুরচির গন্ধ শোঁকে না, ব্যালাইগুরা পরস্পরের গন্ধ শোঁকে। দূরত্ব আঁচ করে। শক্ত শরীরে টিপে টিপে যেন আক্রমণের ভয়ে এগোয় অন্ধ দুটো। অদৃশ্যেও যেন ব্যর্থ না হয় লক্ষ্য।

কুরচি হাত বাড়ায়। বাড়িয়ে, দুজনকেই ধরে।—আয়, আয়, বোস্।

ওপাশের ঘর থেকে পাখিটা ডেকে মরছিল, পিক্‌চি পিক্‌চি, পিক্‌র্‌র্‌র্ পিক্‌র্‌র্‌র্! মহাকাল, সর্বনাশের জন্য তুমি আমার চোখের সামনে থেকে ওদের নিয়ে গেলে।

মহাকালের শোনবারও সময় নেই আর। এখন তার সেই গতি, যে গতিকে মানুষ চেনবার আগে, বুদ্ধি দিয়ে বোঝবার আগে, চলে যায় ঝড়ের বেগে।

স্থূলা দু'হাতে সাপটে ধরল কুরচিকে। বটা কুরচিকে ধরতে গিয়ে, স্থূলার বাঁধন খুলে দিতে চাইল।

স্থূলা চিৎকার করে উঠল, না!

বটা মুহূর্তে 'না' শব্দটার মুখের ওপর সমস্ত শক্তি দিয়ে ঘুষি মারল।

স্থূলা চিৎকার করে উঠল, আ!

চিৎকার করতে করতেই স্থূলা কুরচিকে ছেড়ে কঠিন হাতে জড়িয়ে ধরল বটাকে। দুজনেই জাপটাজাপটি করে আছড়ে পড়ল মাটিতে। কতগুলি চাপা হুঙ্কার, আর মাঝে মাঝে দুটি মত্ত হস্তীর মাটিতে আছড়ে পড়ার ধুপ্‌ধাপ শব্দ। তার সঙ্গে কানী কুরচির আর্তনাদ, মরছে, হে ভগমান, কানা দুটো মরছে। আমি পালাই গো, আমি পালাই।

দুজনেই গিয়ে বেড়ার টিনে পড়ল হুড়মুড় করে। দুটো কুকুর ঘেউ ঘেউ করে ছুটে এল গুদামঘরের দিকে। এসে, অন্ধকারে কানাদের লড়াই দেখে আরো জোরে ডাকতে লাগল, ঘেউ ঘেউ ঘেউ।

হঠাৎ দুজনে ছিটকে পড়ল দুদিকে পরস্পরের ধাক্কায়। তারপর স্তব্ধ। শুধু ঘন ঘন নিঃশ্বাসের শব্দ।

মহাকাল নির্বিকার, নিয়মের দণ্ড সে নামায় না।

কানী কুরচি কাঁদছে গুঙিয়ে গুঙিয়েঃ ওরা বেশি কাছে কাছে থেকেছে, তাই এক দণ্ডও সইতে পারছে না। হে ভগমান!

ওপাশের ঘর থেকে পাখিটা ডাকছে, ভয়ে ভয়ে, প্রিক্ প্রিক্, মরবে, মরবে !

মরবে, তাই মারতেই চায়। অন্ধকারের মধ্যে কি একটা শক্ত জিনিস দুম্ করে পড়ল টিনের বেড়ায়। একটু পরে, আর এক দিকে আর একটা। অন্ধ দুটো পরস্পরকে দূর থেকে গুদামে পড়ে-থাকা ভারি কাঠের টুকরো ছুঁড়ে মারছে।

কুরচি চাপাকান্নায় ফিস্ ফিস্ করছে, লড়ছে এখনো লড়ছে, এবার মরবে। পালাই, আমি পালাই।

লাঠি ঠুকে ঠুকে বেরিয়ে যায় কুরচি। তার লাঠিঠোকার শব্দটা শোনার জন্যে এক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে দাঁড়ায় ব্যালাইগুরা। তারপরে আবার ওঁত পাতে।

ইতিমধ্যে বাতাসটা একটু কমে এসেছে। মেঘ দল পাকাচ্ছে আবার।

রাত পোহায়। কলকাতার গাড়ি আসে। রাস্তার উপরে দেখা যায় দুই ব্যালাইগুাকে। দেখে ওদের কিছু বোঝা যায় না। সেই চিরকালের অসহায় দুটি অন্ধ, দুটি কানা ভিখারি। লোকে চেয়ে দেখল না, কোথায় ওদের ঠোঁটের কষে কেটে গেছে, মাথা গেছে ফুলে।

ওরা মাগল, কানী কুরচী মাগল।

ব্যালাইগুারা গাছতলায় গিয়ে বসল। কথা বলল না। কথা ওরা আর কোনোদিন বলবে না। কিন্তু কানী কুচরি ওদের সঙ্গে একটি কথাও বলল না আজ। একবারো অভিমান করল না।

সন্ধ্যা ঘনাল আবার। অন্ধকার নেমে এল গুঁড়ি মেরে মেরে, হিংস্র কামট-সংকুল ইছামতীর কূল বেয়ে বন ও ঝুপসি-ঝাড়ের কোল ঘেঁষে ঘেঁষে।

কিন্তু কানী কুচরি আর স্থূলা-বটা আজ সরে গেছে পরস্পরের কাছ থেকে। ঘোর সন্ধ্যার অনেক আগেই কানী কুরচি সরে পড়েছে।

প্রথম চমক ভেঙেছিল স্থূলার। তা ছাড়া ওর ঝুলঝাপ্পা ছেঁড়া জামার ভিতরে, বুকের কাছে জ্বালা করছে বড়। বটা কামড়েছে, বোধহয় মাংস তুলে নিয়ে গেছে। বটার কাছ থেকে এক সময়ে সরে গেল সে। আস্তে আস্তে লাঠি ঠুকে ঠুকে চলে গেল গুদামের কাছে। এসে চাটাইয়ের ওপর হাতড়াল। কুরচি নেই। ওপাশের ঘরটায় গেল। কাঠের পাটাতন হাতড়াল, কুরচি উধাও।

বাতাস নেই, শুধু মেঘ। অন্ধকারে জোনাকিরা ব্যাকুল হয়ে উড়ছে।

শুধু ইছামতীর ছলছলানি আর পাখিটার ডাক শোনা যাচ্ছে, পিক্‌পিক্ পিক্‌চা পিক্‌চা! মহাকাল, ভয় করছে গো, আমার ভয় করছে!

এই অন্ধকারের মতো অপলক-চক্ষু মহাকাল পল গুনছে। সময় নেই, সময় নেই, এই অন্ধলীলা ত্বরান্বিত করতে হবে।

আবার বেরিয়ে এল স্থলা। কুরচি নেই। বটাকেও ফেলে এসেছে। কিন্তু বুকটা জ্বালা করে। স্থলা এগিয়ে গেল আরো পূবে। আরো অনেকগুলি গুদামঘর বে-ওয়ারিশ পড়ে আছে। তারই একটার মধ্যে ঢুকে, স্থলা উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ে।

তারপর আসে বটা। স্থলা পলাতক। কুরচির কোন পাত্তা নেই। তলপেটের কাছে একটা ভীষণ ব্যথা তার। স্থলা অনেকগুলি ঘুষি মেরেছে। একটু ঝুঁকে চলতে হচ্ছে বটাকে। কিন্তু আক্রোশে ও সন্দেহে জ্বলছে বটা। দু'জনে পালিয়েছে?

প্রথমে নিজেদের ঘরটায় ঢুকল বটা। নেই সেখানে কেউ।

পাখিটা আতঙ্কে ডেকে উঠল, পিক্ পিক্, পিক্‌চা। ব্যালাইগুা যাসনে। ওপাশের ঘরটায় গিয়ে উঠল বটা। কাঠের পাটাতন দেখল, কেউ নেই। বেরিয়ে এল বটা। ফিরে গিয়ে দাঁড়াল পুরনো ঘরটার কাছে। ঢুকতে গিয়ে থম্‌কে গেল। ঠুক ঠুক শব্দ শোনা যায়। শব্দটা এগিয়ে আসছে। দুটো ঘরের মাঝামাঝি এসে থামল শব্দটা।

বটার বিশ্বাস হল, কানী কুরচি। আক্রমণের ভয়ে যথেষ্ট শক্ত হয়ে সে বলল, কুরচি ব্যালাইগুানি নাকি গো?

কানী কুরচিই। কিন্তু ঘৃণায় সে কোনো জবাব দিল না। লাঠি ঠুক্ ঠুক্ করে সে নিজের ঘরটায় গিয়ে ঢুকল।

দাঁতে দাঁত চাপল বটা। কথা যখন নেই, তখন স্থলা-কানা নিশ্চয়। সেও আর কোনো কথা না বলে, চাটাইয়ের ওপর গিয়ে বসল। কিন্তু বসতে পারল না, আবার উঠল। মহাকাল ওকে টেনে তুলল। সে-ই ব্যালাইগুাদের বার করে এনেছে তাদের গোষ্ঠি-নির্ভর ভীরু অন্ধকার গুহা থেকে।

বটা আসে বাইরে। এসে দাঁড়ায় মেঘ-অন্ধকার আকাশের নিচে। শেয়াল একটা প্রায় শুঁকেই যায় ওকে। ক্রুদ্ধ মানুষের গায়ের গন্ধ পায় পশুরা। শেয়ালটা পালায়। জোনাকিরা গায়ে বসে তার।

মহাকাল নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে আছে বটার দিকে।

পাখিটার স্বর যেন ভেঙে গেছে। মাঝে মাঝে ডাকছে, পিক্...পিক্...।

হঠাৎ বটা মাথা ঝাড়া দিয়ে সোজা হবার চেষ্টা করল। লাঠি টিপে টিপে ফেলে ওপাশের ঘরটায় গিয়ে উঠল সে। হামা দিয়ে এগোল কাঠের পাটাতনের দিকে।

বটার রক্তে আগুনের দপ্‌দপানি। সমস্ত অনুভূতি হারিয়েছে তার। শুধু কানে শুনতে পাচ্ছে নিঃশ্বাসের শব্দ। স্থলার নিঃশ্বাস। আরো কাছে এল, আরো। তারপর অন্ধটা অব্যর্থ নিশানায় দু'হাতে টিপে ধরে নিঃশ্বাসটা বন্ধ করল—কুরচির। প্রচণ্ড শক্তিতে, শব্দের আগে, একবার নড়ে ওঠবারও আগে। যখন বুঝল, সব শেষ হয়েছে, তখন আস্তে আস্তে হাতটা শিথিল করল বটা। শিথিল হাতটা সরাতে গিয়ে কুরচির বুকে হাত পড়ল বটার। আর একটা হাত তার শনমুড়ি চুলে।

আর নিজের গলায় দুটো হাত চেপে বটা চিৎকার করে উঠল, কথাহীন, স্বরহীন, তীরবিদ্ধ একটা বুনো শূয়োরের মতো। লাঠিটা কুড়িয়ে প্রায় হামা দিতে দিতে বেরিয়ে গেল বাইরে। ঘরের পিছনে, নদীর ধারে।

ঠিক একইভাবে, স্থলা ফিরে এসেছে পুবের গুদামঘর থেকে। টিপে টিপে গেছে পুরনো ঘরের চাটাইয়ের কাছে। কোনো সাড়া পায় নি। শব্দ পায় নি কোনো নিঃশ্বাসের।

ফিরে গেছে ওপাশের ঘরটায়। কোনো শব্দ নেই। প্রায় হামা দিয়ে দিয়ে গেল কাঠের পাটাতনের কাছে। হাতে ঠেকল দুটি পা। হাতটা পিল্‌পিল্‌ করে উঠল গা বেয়ে। যা সন্দেহ করেছিল। কুরচি! কানী কুরচি! ব্যালাইগুনি! আরো ওপরে হাত তুলল। কুরচি। পুরোপুরি কুরচি।

এক মুহূর্ত সময় না দিয়ে দু'হাতে সাপটে ধরে স্থলা ঝাঁপিয়ে পড়ল কুরচির উপর। অন্ধকার ঝোড়ো-উন্মাদ কয়েকটা মুহূর্ত! পেয়েছি, পেয়েছি! স্থলার রক্ত থেকে সেই উত্তেজিত রুদ্ধশ্বাস উল্লসিত দুর্জয় মুহূর্তটি কাটবামাত্র, সে থমকে গেল। নাড়া দিল কুরচিকে। ফিসফিসিয়ে ডাকল, কুরচি, ব্যালাইগুনি।

মরা ব্যালাইগুনি অনড় নিঃশব্দ। স্থলা কুরচির বুকে কান পাতল। ধুকধুকি বন্ধ। নাকের কাছে হাত নিয়ে গেল। উষ্ণ নিশ্বাস নেই। মুখে হাত দিল, কুরচির মুখ হাঁ করে আছে।

স্থলা চাপা গলায় চিৎকার করে উঠল, মরা, মরা।

সেও ছুটে গেল ঘরের পিছনে নদীর ধারে।

দুজনেই শুনতে পেল দুজনের চাপা চিৎকার। চিৎকার নয়, কান্না।

ভাষাহীন, স্বরহীন কান্না! মহাকাল হাসল। পাখিটা চিৎকার করতে লাগল, পিক্ পিক্, পিকর্ পিকর্।

মহাকাল, এ কি করলে গো, এ কান্না যে থামবে না।

থামল না সে কান্না কোনোদিন। তারপরও ওরা ভিক্ষে করে। কুরচির মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। খুনীকে খুঁজে পাওয়া যায় নি। জন্মান্ধদের কেউ সন্দেহ করতেও পারে নি।

ওরা ভিক্ষে করে। তারপর রাত্রে ফিরে এসে কাঁদে ভাষাহীন, স্বরহীন গলায়। পাখিটা কাঁদে, পিক্ পিক্ পিক্ পিকু। এ কান্না কোনদিন থামবে না। কোনোদিন না।

ছেঁড়া তমসুক

তখন রাত্রি প্রায় আটটা। সেই সময় খবরটা এল। একজন এসে ঠোঁটটা বেঁকিয়ে কেমন একরকমের বিদ্রূপময় অথচ নির্বিকারভাবে হেসে খুব সাধারণ গলাতেই বলল, "ওই যে, ওই সেই মেয়েটা, মারা গেছে।"

পৌষ মাস। অন্ধকার ঘনিয়েছে প্রায় ঘণ্টা তিনেক আগেই। মফঃস্বল শহরের সদর-অন্দর, সব রাস্তাই এতক্ষণে ফাঁকা হয়ে আসার কথা। হয়ত অন্যান্য দিন। কিন্তু আজ শনিবার। তাই এখনও কিছু লোকের আনাগোনা রয়েছে।

রেলওয়ে স্টেশনের কাছে ভিড়টা একটু বেশী। কারণ দোকানপাট বেশী, আলোও বেশী আর মানুষের যাতায়াত ত আছেই। তারপর রাস্তাটা উত্তর-দক্ষিণে ক্রমেই ফাঁকা হয়ে গিয়েছে, দোকানপাট কমে এসেছে।

আকাশে কুয়াশা, তারাগুলি মরা চোখের মত নিষ্প্রভ। ধুলো আর ধোঁয়ায় গোটা শহরটা উলঙ্গবাহার শাড়ির মত একটা অশ্লীলতার আবরণ জড়িয়েছে যেন। উত্তুরে বাতাসে শীতের কাঁটা। 'সিটি ফাদার' ষাঁড়টা স্টেশনের বারান্দায় উঠে পড়েছে। রাস্তার কুকুর আর মানুষেরা গরম আশ্রয়ের সন্ধান করছে।

সেই সময় খবরটা এল।

দক্ষিণের ফাঁকায়, রাস্তার উপরে, সেকেলে নিচু-ছাদ, পোকা-খাওয়া কড়ি-বরগা আর চুন-বালি-খসা 'গণেশ কাফে'র ঘরে সংবাদটা এল। গণেশ কাফেতে তখন জম-জমাট আড্ডা। চায়ের কাপ-গেলাস-ভাঁড়, সবরকম পাত্রই জড় হয়েছে টেবিলের উপর। প্রায় একটা গণতান্ত্রিক ঐক্যের মত।

সস্তা সিগারেট আর বিড়ির ধোঁয়ায় ঘরটিকে গ্রাস করেছে।

মালিক লুঙ্গি পরে চাদর জড়িয়ে বসে আছে কাউণ্টারে। নতুন লোক আসার সম্ভাবনা কম। এখন যারা আছে, তারা প্রতিদিনের, প্রায় সব সময়ের। অধিকাংশই স্থানীয় বেকার যুবক। কলেজ থেকে ফেলকরা, ভেগে-পড়া কিংবা পড়তে-না-পাওয়াদের ভিড়ই বেশী। ময়লা পাজামা, ধুতি, প্যাণ্ট, ছেঁড়া জামা, উসকো-খুসকো চুল আর পুরোপুরি খেতে না-পাওয়া মুখের একটা লেপটা-লেপটি দঙ্গল। অবশ্য এদের মধ্যে এদেরই

দু-একজন ফিটফাট চকচকে, ভরপেট-খাওয়া সুস্থ বন্ধুবান্ধব যে না দেখা যায় তা নয়। তবে সেটা অনিয়মিত। খাপছাড়া, করুণা-করুণা ভাব। কংগ্রেস, কমিউনিস্ট, পি এস পি, আর এস পি, স্কুল-কলেজ, মিউনিসিপ্যালিটি, খুন-জখম-মারামারি, প্রেম-ফুসলানো-হরণ, গান-বাজনা-থিয়েটার এই শহরের আদি ও অন্ত এখানকার আলোচনার বিষয়। মায় সাহিত্য পর্যন্ত। চেঁচামেচি উত্তেজনা ত আছেই। হাসাহাসি গালাগালি আছে। হাতাহাতিও যে নেই, তা নয়। মাঝেমধ্যে ছুরিও বেরিয়ে পড়েছে ক্রুদ্ধ হুঙ্কারের মধ্যে। হয়নি যদিও, তবু খুনোখুনিরও আশঙ্কা দেখা দিয়েছে অনেকবার। আর এরই মধ্যে আবার কান্নাও আছে। রাত্রি আটটার সময়, আড্ডা তখন বেজায় জমজমাটি। কেরোসিন কাঠের পার্টিশান দেওয়া দুটি ছোট ছোট 'ফর লেডিজ'এর খুপরিতেও আড্ডা জমেছে। যদিও লেডি নেই একজনও।

'গণেশ কাফে'র মালিক গণেশও আড্ডার শরিক হয়ে গিয়েছে। বাতাসহীন চাপা ঘরটায়, সস্তা সিগারেট আর বিড়ির ধোঁয়ায় একটি নরক-গুলজার-করা প্রেতছায়ার মত দেখাচ্ছিল সবাইকে। নানান রকমের কথা, হাসি ও বাদ-প্রতিবাদে সবাই যখন মশগুল, সেই সময়ে একটা নিত্যনৈমিত্তিক পুরনো খবর বলার মত, হেসে নির্বিকারভাবে একজন এসে বলল, "সেই, কলোনি-পাড়ার কাছে, ভটচার্জি পাড়ার রাধু বাঁড়ুজ্যের মেয়ে, আমাদের ফেমাস বিজু, বিজলী হে বিজলী, মারা গেছে।"

নরকটা হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেল। ছায়াগুলি মন্ত্রপড়া জল ছিটনোর মত অনড় নিশ্চল হয়ে তাকিয়ে রইল খবরদাতার দিকে।

একটু পরে একটা মোটা গলা শোনা গেল, "কী ভাবে?"

জবাব শোনবার আগেই আর একজন বলল, "আজ বিকেলেও ত দেখেছি।"

আর একজন, "হ্যাঁ, এখানেই ত দেখেছি সন্ধ্যার সময়।"

বলে সে একজনের দিকে তাকাল। যার দিকে তাকাল, সে দাঁড়িয়ে পড়েছে ততক্ষণে। তার সঙ্গে সঙ্গে আরও দুজন। চব্বিশ-পঁচিশের বেশী কারও বয়স নয়। তিনজনেই প্রায় একসঙ্গে শ্বাসরুদ্ধ অবস্থায় বলে উঠল, "হ্যাঁ, আজ, আজই সন্ধ্যেয় সে ছিল। কিন্তু কি ভাবে মারা গেল? কোথায় আছে?"

যে খবরটা এনেছিল, সে বলল, "নিশি স্যাকরার আমবাগানের ধারে নর্থ কেবিনের কাছে, রেল লাইনের ওপরে।"

"রেল লাইনে ?"

"হ্যাঁ। মালগাড়ির তলায় কাটা পড়েছে। আমি দেখে এসেছি। ঠিক গলার কাছ থেকে—"

"সুইসাইড নিশ্চয় ? নইলে সেখানে রাত্রিবেলা কে যায় ?"

ততক্ষণে সেই তিনজন বেরিয়ে গিয়েছে।

তারপরেও 'গণেশ কাফের' নিচু-ছাদ ঘরটা খানিকক্ষণ যেন দম চেপে রইল। একটু পরে একজনের গলা শোনা গেল, "আশ্চর্য! কিছু বোঝা যায় না আজকাল।"

গণেশ ঘড়ঘড়ে গলায় বলল, "সত্যি! আর এই রেল লাইনটা যেন কী মাইরি।"

কেউ কেউ উঠল। বলল, "যাই, দেখে আসি।"

সেই তিনজন তখন ছুটতে ছুটতে অন্ধকার রেল লাইন দিয়ে নর্থ কেবিনের কাছে এসে পৌঁছেছে। জায়গাটায় রাস্তার আলো আসে না। কেবিনের আলো এসে পড়বার সুযোগ পায়নি একটি গাছের জন্য। গুটি তিনেক টিমটিমে রেল-লণ্ঠন নিয়ে এসেছে কেবিনের কুলি। জি আর পি পুলিশও এসে পড়েছে। মাঝে মাঝে চমকে উঠছে তাদের টর্চলাইটের আলো। কিছু লোকের ভিড় ঘিরে রয়েছে ফোর্থ লাইনের একটা অংশ।

ওরা তিনজনে ভিড় ঠেলে এগিয়ে গেল। লাইনের দিকে একবার তাকিয়ে একই সঙ্গে চোখাচোখি করলে তিনজনে। একটা অসহায় জিজ্ঞাসা ও বিস্ময়ে উদ্দীপ্ত তিন জোড়া চোখ। তিনজনেই যেন পরস্পরকে জিজ্ঞাসা করছে, এটা বিজুই ত ?

হ্যাঁ। বিজুই। চোখ নামিয়ে আবার দেখল তারা বিজলীকে। ঠিক ঘাড়ের কাছ থেকে মাথাটা কেটে গিয়েছে। জড়ান রুক্ষ দীর্ঘ বেণীটা পুরো-পুরি এলিয়ে পড়ে আছে লাইনের মধ্যে, কিন্তু মাথা সুদ্ধ, লাল ফিতে স্লীপারের উপর। মাথাটা লাইনের মধ্যে, শাড়ি-জড়ানো দেহটি লাইনের বাইরে পাথর আর ঘাসের উপর যেন প্রায় কাত হয়ে এলিয়ে পড়ে আছে।

রেল-লাইনের টিমটিমে আলো, বিন্দুর মত চিকচিক করছে বিজলীর চেয়ে থাকা স্বচ্ছ চোখে। হাঁ-মুখটা খোলা, ঝকঝকে সাদা দাঁতে আলো পড়েছে। কপালের রক্তটিপটা জলজ্বল করছে এখনও। আর এদিকে ঘাড়ের কাছ থেকে খয়েরীডোরা কালোপাড় শাড়ির আঁচলটা ঠিক বুকের উপর দিয়ে টানা আছে।

কোথাও যেন এতটুকুও অবিন্যস্ত হয়নি। কেবল বাঁ পায়ের দিকে শাড়িটা একটু বেশী উঠে গিয়েছে, যে-রকম উঠে যায় ঘুমন্ত মানুষের। হাতের লাল কাচের চুড়িগুলির কয়েকটা ভেঙে পড়ে আছে হাতের কাছেই। বাকিগুলি সবই আস্ত আছে। কোথাও রক্ত লেগে নেই। কেবল ঘাড়ের কাছে খয়েরী ডোরা কাটা শাড়িটা পেরিয়ে লাল ব্লাউজের বুকের উপর গড়িয়ে এসেছে একদলা রক্ত। শীতের উত্তুরে হাওয়ার টানে তা এর মধ্যেই শুকিয়ে যেন বাসী হয়ে গিয়েছে।

তা ছাড়া আর সব ঠিক আছে। যেন, ঘাড়ের সঙ্গে মাথাটা জুড়ে দিলে, এখুনি বিজু ওর বিজলী চমক হাসি হাসতে হাসতে উঠে বসে চমকে দেবে সবাইকে। যে-হাসিতে এই মফঃস্বল শহরের সবাই কোনও না কোনও দিন একবার চমকেছে।

বিজু, হ্যাঁ বিজুই। কলঙ্ক যার অঙ্গের ভূষণ ছিল। যে-কলঙ্কিনীর কথা বলতে রসিয়ে উঠত শহরের ইতর ভদ্র। যাকে সহজলভ্য মনে করে সেই চিরকালের টোপ-ফেলাফেলি খেলা অনেক হয়েছে কিন্তু প্রচণ্ড আক্রোশে গর্জাতে হয়েছে নীরবে ও সরবে। অথচ যাকে কলেজের কয়েকটা পড়ো কিংবা পড়তে পড়তে সরে-পড়া বখো দুর্বিনীত ছেলের সঙ্গে প্রায়ই এখানে সেখানে ঘুরে বেড়াতে দেখা গিয়েছে নির্লজ্জের মত। সন্দেহজনকভাবেই রাস্তার উপর গায়ে গায়ে, জোরে হেসে হেসে, শহরের গায়ে জ্বালা ধরাতে দেখা গিয়েছে। এমন কি আজও দেখা গিয়েছে। এ সেই বিজলী, এই রেলে-কাটা মেয়েটা।

'গণেশ কাফের' এই তিনজন আবার চোখাচোখি করল। ওরা তিনজন সেই কয়েকটা বখো ছেলে, যাদের সঙ্গে বিজুকে দেখা যেত সব সময়। তাদের তিনজনেরই চোখের দৃষ্টি যেন গলায় দড়ি দেওয়া লাসের মত আরও উদ্দীপ্ত। একটা মহা-শূন্যের মত অশেষ বিস্ময় ও প্রশ্ন নিয়ে যেন এখুনি চোখগুলি রক্ত কিংবা জলের ফোয়ারা ছুটিয়ে ফেটে পড়বে।

বিজু, বিজুই ত। যে আজ বিকেলেও তাদের তিনজনের সঙ্গে 'গণেশ কাফে'তে ছিল। যার কথায় হাসিতে, এমন কি রাগ ও অভিমানের মধ্যে, একবারও এই কাটা পড়ার ছায়া দেখা যায়নি।

তবে ?

ভিড়ের মধ্যে কার একটি রসাল দীর্ঘ হুঁ-উ-উ শোনা গেল। তারপর চাপা গলায়, "বড্ড বাড়িয়েছিল। বোঝ এবার।"

তিনজোড়া চোখ সঙ্গে সঙ্গে ভিড়ের দিকে ছুটে গেল যেন খ্যাপা নেকড়ের মত। কাউকেই চেনা যায় না। রেল-লণ্ঠনগুলি বিজলীর কাছে নামান। বিজলীকে ঘিরে রয়েছে। ভিড়ের লোকগুলি অস্পষ্ট।

অচেনা আর চেনা লোকের গুঞ্জন একইভাবে চলছে। কে? কার মেয়ে? ও! সেই, সেই মেয়ে? কী হয়েছিল?

বুঝে নাও! হয়েছিল একটা কিছু নিশ্চয়।

হবে, জানাই ছিল।

বিজলীর বাবা রাধুবাবুকেও দেখা গেল 'জি আর পি'র দারোগার পাশে। বিজুর দিকে ওঁর চোখ নেই। অন্যদিকে তাকিয়ে আছেন কোল-বসা চোখে। খুবই অসহায়, তবু যেন একটা অপরাধীর ভাব। বিজলীর লাস কিংবা লাস দেখতে-আসা ভিড়ের কারও দিকেই তাকাতে পারছেন না।

দারোগা জিজ্ঞেস করল, "কত বয়স হয়েছিল আপনার মেয়ের?"

"তেইশ।"

"বিয়ে দেননি কেন?"

দারোগার মতই প্রশ্ন। রাধুবাবু বললেন, "সঙ্গতি ছিল না।"

"হুঁ। কী হল হে, লাস বাঁধ।"

একটি সেপাই জবাব দিল, "বাঁশ নিয়ে জমাদার আসছে স্যার।"

"হুঁ।" দারোগা আবার বলল, "থার্ড ইয়ার থেকে পড়া ছেড়ে দিয়েছিল কেন আপনার মেয়ে?"

"ছ মাসের বেতন বাকী পড়েছিল, তাই।"

"উঁ, তা হলে বলছেন, কোন চিঠিপত্রই রেখে যায়নি?"

"না।"

"আঁ-হা! দেখবেন মশাই, চেপে টেপে যাবেন না, পরে মুশকিলে পড়ে যাবেন।"

রাধুবাবু যেন ধরা-পড়া চোরের মত অন্যদিকে তাকিয়ে রইলেন।

দারোগার টর্চলাইট একবার ঝলকে উঠল কাটা বিজলীর উপর।

লাস বেঁধে নিয়ে যাওয়ার লোকেরা এল।

ওরা তিনজন এগিয়ে গেল রাধুবাবুর কাছে। ওদের তিনজোড়া উদ্দীপ্ত চোখে একটা হিংস্র প্রশ্ন বাগিয়ে ধরা ছুরির মত চকচকিয়ে উঠল নিঃশব্দে। রাধুবাবুর কাছে তারা জানতে চায় কী হয়েছিল। কেন মরেছে বিজলী।

রাধুবাবু তেমনি অসহায়ভাবে তাকালেন। বললেন প্রায় চুপি চুপি, "এই যে শঙ্কর আর নরেশ এসেছ। ও প্রভাতও এসেছ?"

হ্যাঁ, ওরা এসেছে, কিন্তু সেটা বড় কথা নয়। রাধুবাবু কী জানেন, সেইটি বলুন। তারা জানতে চায় তাদের, হ্যাঁ তাদের যে বিজু হাসতে হাসতে এসেছিল 'গণেশ কাফে' থেকে, সে কেন গলা বাড়িয়ে দিয়েছে রেলের তলে।

রাধুবাবুও ওদেরই চোখের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। এতক্ষণে দেখা গেল, ওঁর কোল বসা চোখ দুটি সর্দিজ্বরের মত ভেজা ভেজা লাল হয়ে উঠছে। দাঁতহীন ঠোঁট দুটি চাপছেন বারে বারে। বললেন, "কিছু জানিনে। বিজুর তোমরা বন্ধু। তোমরা, তোমরা কিছুই জান না?"

শঙ্কর নরেশ আর প্রভাত আবার চোখাচোখি করল। বুঝল ওরা, রাধুবাবু সত্যি কিছু জানেন না। তবে? তবে কে বলবে? কে জানে?

তিনজনেরই দৃষ্টি গিয়ে পড়ল বিজলীর উপরে। ওরা চমকে পরস্পরের হাত চেপে ধরল। যেন ছিটকে বেরিয়ে যাবে কোথাও। দেখল, বিজলীর শ্যামলী মুখখানি ওর বুকের উপর বসিয়েছে জমাদারেরা। আর বিজলী এখন চেয়ে আছে ঠিক তাদের তিনজনের দিকে।

ওরা তিনজনেই যেন নিঃশব্দে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠল, বি—জু! বি—জু!

জমাদারেরা লাস কাপড়ে বেঁধে বাঁশে ঝুলিয়ে নিল। দারোগা ডাকল, "আসুন রাধুবাবু।"

ভিড় ছত্রভঙ্গ হল। একদল লেগে-থাকা মাছির মত চলল 'জি আর পি' পুলিশ অফিসের দিকে, লাসের পিছু পিছু।

ওরা তিনজন কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইল সেখানে। তারপর আরও খানিকটা উত্তরদিকে গিয়ে, আঁশশ্যাওড়ার জঙ্গল পেরিয়ে নির্জন আর অন্ধকার রেলপুলটার উপরে গিয়ে উঠল। রেলিংএর উপর ভর দিয়ে, ঝুঁকে দাঁড়াল। জংশন স্টেশনের সর্পিল লাইন একেবেঁকে চলে গিয়েছে অনেক দূর।

উপর থেকে দেখা যাচ্ছে, গোটা শহরটাকে ধোঁয়া গ্রাস করে ফেলছে।

ওদের তিনজনকেও একটা ভয়ংকর কিছু গ্রাস করে ফেলছিল। শত চেষ্টাতেও কারও গলা দিয়ে যেন একটি শব্দও বেরুল না।

কেবল নরেশ দম নিয়ে বলল, "বিজু-বিজুটা—"

আর কিছু বলতে পারল না। কেবল মনে পড়ল, রোজকার মত আজকেও বিজু কেমন খিলখিল করে হেসেছিল বিকেলে।

তিনজনই চুপ করে রইল। ঝিঁঝিঁর চিৎকার শোনা যাচ্ছে।

বিজুর খিলখিল হাসি ওদের তিনজনের বুকেই যেন বাজতে লাগল। তিনজনেই তাকাল ফোর্থ লাইনের সেই জায়গাটায়। কিছুই দেখা যায় না। ওখানে লাইনের উপর হয়ত এখনও রক্তের দাগ লেগে আছে। হয়ত এতক্ষণে শেয়াল এসে চাটতে আরম্ভ করেছে। আর ওরা তিনজন যখন চলে যাবে পুল থেকে নেমে, গভীর রাত্রে সেই খিলখিল হাসিটা হয়ত রেল লাইনের লোহায় বেজে উঠবে। কেননা, বিজুর গলাটা ওই লাইনের উপরেই কাটা গিয়েছে।

ওদের তিনজনকে এখন যে-কোনও লোক পুলের উপর এই অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলে খারাপ কিছু সন্দেহ করত। যেন তিনটে ষড়যন্ত্রী কোন সর্বনাশের মতলব আঁটছে। ওদের ময়লা ছেঁড়া জামা কাপড় উসকো-খুসকো চুল, সর্বোপরি ওদের রক্তাভ চোখে কুটিল প্রশ্ন ও কঠিন প্রতিহিংসার একটা বাসনা দপদপ করছে।

মণি-হারা অজগরটার মত দারুণ যন্ত্রণায় ও আক্রোশে যেন ওরা মনের অন্ধকারে হাতড়ে ফিরছে বিজুর মৃত্যুর কারণটা। মনে পড়ছে। আজ বিকেলে, যখন বিজু এল ওরা বললে, "বিজু তুমি লেট।" বিজু বললে, "এখন থেকে লেট হতে হতে আর আসাই হবে না। ওরা বললে, "কেন?"

বিজু হেসে বললে, "বা রে, আমার বুঝি বে-থা হবে না। তোমাদের তিনজনের সঙ্গে ঘুরলেই আমার চিরকাল চলবে?" বলে জোরে হাসল।

কিন্তু কী এসে যায় তাতে? ওকথা বিজু প্রায়ই বলত। নতুন কিছু নয়। হ্যাঁ। লেট বিজুর প্রায়ই হত। মনে কোনও রাগ থাকলে, কিংবা এমনি রহস্য করেও কতদিন বলেছে, "আর আসা হবে না। আজকেই ইতি।" এরকম অনেক ইতি হয়েছে, কিন্তু তারপরে পুনশ্চের কোন অভাব হয়নি। সুতরাং বিজুর আজকের কথায় কিংবা ভাবে নতুন কিছুই ছিল না, যা দিয়ে শেষ দেখাকে চিহ্নিত করা যায়।

তবে? তবে কী হল? ওঁরা তিনজনে একই সঙ্গে ফিরে তাকাল আবার লাইনের দিকে। তিনজনেরই যেন লাইনটার উপরে গিয়ে কপাল কুটতে ইচ্ছে করছে। কপাল কেটে কুটে জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছে করছে, "কেন, কেন বিজু?"

কিন্তু ওরা তিনজনেই মুখ চেপে রইলো রেলিং-এ। কেননা, কপাল কুটে রক্ত-গঙ্গা করলেও লোহার লাইনটা কিছু বলবে না।

শুধু বিজুকে ঘিরে ওদের পুরনো দিনগুলি আবর্তিত হতে লাগল। সেই দিনগুলি, যখন বিজলী ব্যানার্জী ছিল ওদের সহপাঠিনী।

যখন ওরা ছিল ছাত্র। যখন ওদের জীবনে ছিল ঝড়ের বেগ, ফেনিলোচ্ছল প্রাণ আর চোখে স্বপ্নের কাজল। যখন বিজু ক্লাসে আসত রাজেন্দ্রাণীর মত, আর ওরা ছিল যেন বিদ্রোহী প্রজা। রাণীর স্তুতি করত ওরা বিদ্রূপ দিয়েই, বেয়াদপির হাসি থাকত ওদের ঠোঁটে ও চোখে। কিন্তু বিজু ছুটে যায়নি প্রিন্সিপালের ঘরে। খাঁটি রাজেন্দ্রাণীর মত শুধু হেসেই শান্ত করেছে সেই বিদ্রোহীদের। যে-হাসিটা তখন থেকেই বিজুর কলঙ্কের সন্দেহ ঘনিয়ে এনেছিল সকলের মনে। আর সকলের মত ওরা তিনজনও সন্দেহ করত। কলঙ্কিনী ভেবেই ওদের বিদ্রোহ মাত্রা ছাড়িয়ে উঠতে চেয়েছে মাঝে মাঝে।

কিন্তু ছাত্র-জীবনের যেখানটায় থাকা উচিত ছিল নিশ্চিত আশ্রয়, আহার আর একটু ভালবাসা, ওদের সেই আসল নৌকাটাই ছিল তলাফুটো। জীবনে যে-ঝড়ের বেগটা ছিল, সেটা শুধু নোঙর ছিড়ে টেনে নিয়ে গিয়েছে সর্বনাশের মধ্যে। কলেজের প্রাঙ্গণ ছেড়ে কবে ওরা জীবনের আগুন-লাগা অঙ্গনে ঝাঁপিয়ে পড়েছে, নিজেদেরই মনে নেই। মনে নেই, বাইরের প্রাঙ্গণে এসে কলেজের দলাদলি ভুলে, কবে ওরা তিনজন বন্ধু হয়ে গিয়েছিল! বেকারি আর অনাহারের জ্বালায় কবে ওরা শহরের সেরা দুর্বিনীত ও বেয়াদপ বলে কু-খ্যাত হয়ে গিয়েছে, সে-কথাও ওরা জানে না।

আর কে এক বিজলী ব্যানার্জিকে নিয়ে কোন একদিন ওরা একটু মস্তানি করতে চেয়েছিল, সে-কথাও ওদের মনে থাকত না, যদি না তিনবছর আগের এক সন্ধ্যায়, শহরের দক্ষিণে, নিরালা রেল-কালভার্টের উপর দেখা হয়ে যেত। রাজেন্দ্রাণীর চোখের কোলে সেদিন গভীর পরিখা। চোখ দুটি বড় বেশী ভাসা ভাসা, করুণ। মুখখানি শুকনো। হাত ভরতি বাদাম ভাজা। মুখেও দু-একটি দানা ছিল।

ওদের তিনজনকে দেখে এক মুহূর্ত বুঝি লজ্জা পেয়েছিল বিজু। পর-মুহূর্তেই সেই রাজেন্দ্রাণীর হাসি বিদ্যুতের মত ঝিলিক দিয়ে উঠেছিল তার করুণ মুখে। বলেছিল, "আপনারা এখানে?"

বিজলীকে দেখা মাত্র ওদের তিনজনেরই জিভ্ চুলকে উঠেছিল বিদ্রূপ করার জন্যে। মনে মনে তৈরী হয়ে উঠেছিল পিছনে লাগার ফিকিরে।"

কিন্তু বিজলীর কালো চোখ দুটিতে কী যাদু ছিল, ওদের ইচ্ছে পূরণ

হয়নি। বরং সেই কুখ্যাত দুর্বিনীতেরা বিজুর গায়ে-পড়া আলাপে যেন একটু থিতিয়েই গিয়েছিল। বলেছিল, "এমনি।"

কিন্তু একটু রহস্যের আভাস যেন চিকচিক করে উঠেছিল বিজুর কালো চোখে। বলেছিল, "আরও কদিন দেখেছি এখানে আপনাদের।"

বলে হাতের মুঠি খুলে বাড়িয়ে দিয়েছিল তিনজনের দিকে। বলেছিল, "নিন, বাদাম খান।"

ওরা তিনজন মুখ চাওয়া-চায়ি করে বাদাম নিয়েছিল। দেখলেই বোঝা যাচ্ছিল, তিনজনের মুখে উপোসের ছাপ। ছেঁড়া জামা কাপড় আর উসকো-খুসকো চুলে তিনজনকে যতটা হতভাগা মনে হচ্ছিল, তার চেয়ে বেশী মতলববাজের ছাপ ছিল ওদের চোখে মুখে।

ওদের তিনজনকেই একটা অস্বস্তি ঘিরে ধরেছিল। কী বলতে চায় মেয়েটা? ওরা কেন আসে এই কালভার্টের কাছে, জানে নাকি সে? জানে নাকি ওই অদূরের সাইডিংএর পাশে থাকদেওয়া রেল-স্লীপারগুলি সরাতে এসেছে ওরা? কেন না, স্লীপারগুলি একটি কাঠের গোলায় পৌঁছে দিলে তবে ওরা কিছু টাকা পাবে। টাকা ওদের চাই, নইলে বাঁচা যায় না। আর বাঁচবার অন্য কোন রাস্তা ওরা আবিষ্কার করতে পারেনি।

কিন্তু বিজলী ওদের কিছুই বলেনি। শুধু সেই হাসিটুকুই লেগে ছিল ঠোঁটের কোণে। বলেছিল, "চলুন, শহরের দিকে যাওয়া যাক।"

অসম্ভব। কাজ হাসিল না করে কেমন করে যাবে ওরা? পা ঘসছিল তিনজনেই।

বিজলী আবার বলেছিল, "চলুন।"

আশ্চর্য! সে-ডাক ওরা ফেরাতে পারেনি। যেন কোন্ সুদূর আবছায়া থেকে এক বিচিত্র রহস্যময়ী তাদের ডাক দিয়ে নিয়ে গিয়েছিল হাতছানি দিয়ে। নিয়ে গিয়েছিল ওদেরই 'গণেশ কাফের' আস্তানায়। আর নিজের খিদের নাম করে এক রাশ খাবার নিয়েছিল। বলেছিল, "টি এক্স আর এর ক্লাস টেনের মেয়েটাকে পড়াই। আজ মাইনে পেয়েছি, খাওয়া যাক।"

তখন ওদেরও চকিতে মনে পড়ে গিয়েছিল কালভার্টের কাছেই টি এক্স আর এর কোয়ার্টার। তাই বিজু তাদের দেখতে পেয়েছিল কয়েকদিন।

ওরা লোভীর মত খেয়েছিল। জানত, রাধু বাড়ুজ্যের এক পাল পুষ্যি-থিকথিক ঘরে কানাকড়িটি না থাকলেও বিজলীর অভাব নেই। তাঁর মেলাই মক্কেল।

খেতে খেতেই তিনজনের মধ্যে কে যেন জিজ্ঞেস করেছিল, "কলেজের খবর কী ?"

বিজু ছোট মেয়েটির মত এক মুখ খাবার নিয়ে বলেছিল, "ছেড়ে দিয়েছি।"

"কেন ?"

"টাকা নেই।"

অবিশ্বাস্য মনে হয়েছিল ওদের। টাকা নেই, সবাই জানত। কিন্তু এ-কথাও সবাই জনত, ব্রজেন পালের মত কাপ্তেন থাকতে, বিজলীর কোনও অভাব নেই। উৎকৃষ্ট ব্যবসায়ী নকুড় পালের নিকৃষ্ট ছেলে ব্রজেন পাল। কিন্তু নকুড়ের মতে, সে ত ভগবানের হাত। ওই হাতটি থাকলে গাধা পিটিয়ে নাকি ঘোড়া করা যায়। আর পালবংশে কলেজের মুখ দেখা সে-ই ত প্রথম। অতএব, বি-এ পাশ করতে দশ বছর লাগলেও ক্ষতি কী ? নিকৃষ্টের পিছনে উৎকৃষ্ট টাকা থাকলেই ত গাধা একদিন ঘোড়ার মত হ্রেষাধ্বনি করতে পারবে।

সেই হ্রেষাধ্বনিরই বাসনায়, খুরেমারা নাল থেকে মাথার শিরস্ত্রাণ পর্যন্ত পোশাকে আশাকে ব্রজেন একটি পাকা অশ্ব হয়ে গিয়েছে তখন। আমেরিকান কাট কোট প্যাণ্টের পকেটে তার উৎকৃষ্ট টাকা বাজত ঝনঝন করে। বিশেষ করে বাজিয়ে ফিরত সে বিজলীর পিছনে। কলেজ থেকে রাধু বাড়ুজ্যের বাড়ি পর্যন্ত ধাওয়া করতে দেখা গিয়েছে ব্রজেনকে। ব্রজেনের কথা শুনে মনে হত, বিজলীর শাড়ি ব্লাউজ, বই-ফাউণ্টেনপেনটি পর্যন্ত ওর টাকাতেই কেনা।

সবাই তাই বিশ্বাস করত। ব্রজেনের সঙ্গে তখন বিজলীকে এদিকে ওদিকে দেখাও যেত। তাই, টাকা নেই শুনে, ওদেরই গলায় খাবার আটকে যাবার দাখিল হয়েছিল।

বিজুর চোখে সেই রহস্যের ঝিকিমিকি আরও কয়েকটা ঘুলঘুলি দিয়েছিল খুলে। হেসে বলেছিল, "কী হল ?"

একজন জিজ্ঞেস করেছিল, "ব্রজেনের সঙ্গে ঝগড়া হয়ে গেছে নাকি ?"

পলকের জন্য বুঝি বিজলীর চিকুর চিকচিক চোখ মেঘে ঢেকে গিয়েছিল। ঠোঁটের কোণে হাসিটুকু গিয়েছিল মরে।

পরমুহূর্তেই আবার হেসে বলেছিল, "ঝগড়া হবে কেন। যতটুকু ভাব দেখছেন, এখনও তাই আছে। ব্রজেন ত কখনও পেছন ছাড়ে না। আপনারা বোধহয় দেখেননি, ব্রজেন ছায়ার মত আমাদের পেছন-পেছন এসেছে। উঁকি দিয়ে দেখুন রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে, এই দিকে চেয়েই।"

ওরা উঁকি দিয়ে অবাক হয়ে দেখেছিল, সত্যি ব্রজেন বাইরে দাঁড়িয়ে। চোখে তার অপেক্ষমান কুকুরটার কৃপা প্রার্থনার দৃষ্টি। ঠোঁটে সিগারেট, দু'হাত প্যাণ্টের পকেটে।

ফিরে দেখেছিল ওরা, বিজলীর ঠোঁটে যেন ক্লান্ত বিষণ্ণ হাসি। আর সেই ওদের তিনজনেরই, বিজলীকে বড় অসহায় মনে হয়েছিল। ওদের দুর্বিনীত বুকেও মানুষের হৃৎপিণ্ডের অবশিষ্টাংশে টনটন করে উঠেছিল যেন একটু।

বিজু কেমন একটু হেসে আবার বলেছিল, "মেয়ে হয়ে ব্রজেনের টাকা কেমন করে নেওয়া যায়, বলুন।"

সেই মুহূর্তেই বিজলীর দিকে তাকিয়ে থাকা চোখের চাউনি একেবারে বদলে গিয়েছিল ওদের। সেই মুহূর্তেই একটি মেয়ে-জীবনের সত্যের তত্ত্বকে আবিষ্কার করে, বিজলীর নতুন পরিচয়ে অপরাধী হয়ে উঠেছিল নিজেরা।

বিজলী তখন উঠে পড়েছিল। ওদের মধ্যেই কে যেন বলেছিল, "চলুন আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসি।"

বিজলীর চোখে আবার সেই রাজেন্দ্রাণীর হাসি উঠেছিল চমকে।

বলেছিল, "ব্রজেনের জন্যে? তার দরকার হবে না। পেছনে ঘুরেই যখন ওর শান্তি, ও ঘুরুক। কিন্তু—"

বিজলীর চোখে রহস্য ঘনীভূত হয়ে উঠেছিল হঠাৎ। একটু থেমে বলেছিল, "কালভার্টের ওই বিচ্ছিরি জায়গাটায় আপনারা আর যাবেন না। রেলের গুড্স-শেডের ওখানটা থেকে পুলিশে বিনা দোষেও লোক ধরে নিয়ে যায়।"

বলে সে চলে গিয়েছিল।

ওরা তিনজন যেন বিজলী-তারের শক্ খেয়ে থমকে তটস্থ হয়ে গিয়েছিল।

সেই ওদের ত্রয়ীকে ঘিরে বিজলীর শুরু। সেইদিনই 'গণেশ কাফে' থেকে গোটা শহরে মাছিরা ভ্যানভ্যান করে উঠেছিল, তিন কুখ্যাতের সঙ্গে বিজলীর মিলনের কথা। বলেছিল, যার যেথা ঠাঁই।

তারপর সে-কাহিনীও পুরনো হয়ে গিয়েছে। এই তিন বছরে, ওই তিনজনের সঙ্গে বিজু প্রতিদিন ঘুরেছে। কবে ওরা 'আপনি' ছেড়ে 'তুমি' হয়ে গিয়েছে। কবে ওরা চারজনের এক সর্বক্ষণের অখণ্ড জুটি হ'য়ে গিয়েছে, নিজেদেরও বোধহয় মনে নেই। দেখে, শহরের টোপ-ফেলা খেলোয়াড়েরা অনায়াস ভেবে অনেকবার উৎসাহিত হয়েছে আর আক্রোশে দাঁত পিষেছে।

ব্রজেন পিছন ছাড়েনি, ক্ষিপ্ত হয়েছে আরও। গোটা শহরের গায়ে অনেক জ্বালা ধরেছে, আজও ধরেছে।

আজও ধরেছে; এবং ধরিয়ে বিজু নিশি স্যাকরার আমবাগানের ধারে এসেছিল কেন?

রেলপুলের উপর থেকে তিনটে অভিশপ্ত প্রেতের মত ওরা আবার ফিরে তাকাল ফোর্থ লাইনের সেই জায়গাটায়।

আর ওদের তিনজনেরই মনে হল, প্রথম দিন বিজুকে যে রহস্য ঘিরে ছিল, আজ সেই রহস্যই ওই ফোর্থ লাইনের উপরে শেষবারের জন্য গলা পেতে দিয়েছে। উদ্ঘাটনের কোন চিহ্নই সে রেখে যায়নি। শুধু তিনটি প্রেতাত্মা চিরকাল ধরে সেই রহস্যের সন্ধানে ফিরবে।

ফিরবে, আর জানতে চাইবে, কেন বিজু নিশি স্যাকরার আমবাগানের ধারে এসেছিল? বিজু তাদের কালভার্টের সেই বিচ্ছিরি জায়গাটায় যেতে বারণ করেছিল, তারা আর যেতে পারেনি। তারপরে বিজু তাদের অনেক জায়গায় যেতে বারণ করেছে, তারা যায়নি।

কিন্তু বিজু কেন নর্থ কেবিনের কাল-আঁধারে, লাইনের উপরে এসে মরেছে? কেন বিজু?

জবাব পাওয়া যাবে না। কালকের শিশিরে-ভেজা লাইনটায় কোন চিহ্নও থাকবে না। কেবল অদূরে ক্রশ লাইনের কাছে, দু ফুট উঁচু সিগন্যালের এই লাল আলোটা জ্বলবে। থিতিয়ে আসার অন্ধকারে এখন ওই আলোর রক্তাভা বেশ গুঁড়ি মেরে মেরে গিয়ে ঠেকেছে ফোর্থ লাইনের বুকে। ওই রক্তাভা রেশটা চিররাত্রি ধরে দগদগ করবে একটি রক্তাক্ত ক্ষতের মত।

কিন্তু তার পরদিন রহস্যের একটি গ্রন্থিমোচন হল। সকলের জিহ্বা আর একবার লকলক করে উঠল। বিকেলের দিকে মর্গ থেকে সংবাদ এল, বিজলী গর্ভবতী ছিল।

আর ওরা তিনজন নরেশ-প্রভাত-শঙ্কর গণেশ কাফেরই 'ফর লেডীজ' খুপরিতে বসেছে মুখোমুখি। চোখে ওদের প্রজ্বলিত ঘৃণা দপদপ করছে। হিংস্র কুটিল সন্দেহে ওরা নিজেদেরই পরস্পরকে হানছে। ওদের গোটা জীবনের সব সর্বনাশ আজ নিজেদের মধ্যেই খুনোখুনি করবার উন্মাদনায় বসেছে কবুল করতে। কে? কে অকলঙ্ক বিজুকে এই কলঙ্কের বোঝা চাপিয়ে মেরেছে?

কবুল খেতে হবে, কেননা তারা তিনজন ছাড়া, বিজলীর এই সর্বনাশের শরিক আর কেউ হতে পারে না। শহরের সব বিষধরদের নির্বিষ করেই এই দুর্বিনীত ছন্নছাড়া ত্রিভুজকে সে নিজেই আশ্রয় করেছিল। একটি মেয়ে যতটুকু পারে, তার সবটুকু নিয়ে সে আত্মসমর্পণ করেছিল এই তিনের কাছে; তার সব সর্বনাশ, তার সব কলঙ্ক সে বন্ধক রেখেছিল এই তিন-জনেরই কাছে, বন্ধুত্বের মূল্যে। সাহস প্রীতি আর স্নেহের মূল্যে। তাদের তিনজনকে সর্বনাশের সব পথ থেকে নোংরা বীজাণুদের সমস্ত আশ্রয় থেকে ফিরিয়ে নিয়ে আসার মূল্যে, বিজু তার ভিতর-দুয়ারের কপাটও দিয়েছিল হাট করে খুলে। রাখেনি কোন সদর অন্দর। তাদের তিনজনের পাঁশ-আস্তীর্ণ ত্রিভুজ-আঙিনাটায় নিশ্চিন্ত হয়ে ফুটেছিল সে ফুলের মত। তারই সুযোগ নিয়ে কে তাকে খুন করেছে প্রকাশ করতে হবে। বন্ধুত্বের হাতে নিজেকে অবশ করে ছেড়ে দেবার তমসুক ছিল তাদেরই হাতে। তারাই কেউ ছিঁড়েছে সেই তমসুক। কবুল করতেই হবে।

সেই কবুল করবার জন্যেই, তিনজনে তারা কাঠের খুপরিটার মধ্যে রুদ্ধ-শ্বাস হিংস্র হয়ে বসে আছে। কারও দিক থেকে কারও চোখ নামছে না। যেন প্রত্যেকেই শিকারী ও শিকার।

বাইরে 'গণেশ কাফে'র গুলতানি চলেছে রোজকার মতই। সেখানে তাকিয়ে বোঝবার উপায় নেই, এই একই ছাদের তলার, একটি খুপরিতে, একটা ভয়ংকর রক্তারক্তির উত্তেজনা ক্রমেই বাড়ছে।

কুটিল সন্দেহে, চাপা ক্রুদ্ধ গলায় হিসিয়ে উঠল শঙ্কর, "আমি নয়, প্রভাত নয়, নরেশ নয়, তবে কে? কে, আমি জানতে চাই। আর কে ছিল তার; আমরা ছাড়া?"

যেন ছোবল মারার আগে, কেউটের মত কাঁধ বাঁকিয়ে নরেশ গর্জে উঠল, "আমিও তাই জানতে চাই। সে যেই হক্, আমি তাকে দু-হাতে টিপে পিঁপড়ের মত মারতে চাই।"

মানুষ যখন ভয়ংকর হয়ে ওঠে, তখন তার সবটাই নাটকীয় দেখায়। প্রভাত পকেট থেকে ওর সেই বিখ্যাত বোতাম-টেপা ড্যাগারটা বার করে খুলে রাখল টেবিলের উপর। শাণিত ছুরিটার তীক্ষ্ণ ধার আজ রক্তলোলুপতায় যেন বড় বেশী চকচক করছে। সে ছুরিটা বিজলীর সামনে যতবার খুলেছে প্রভাত, ততবারই বিজলীর দু চোখে ঘনিয়ে এসেছে অভিমান। বলেছে, "কতদিন বলেছি তোমাকে প্রভাত, ওটা আমি দু চক্ষে দেখতে পারিনে। রেখে দাও।"

বলে নিজের হাতে বন্ধ করে রেখে দিয়েছে। আজ বন্ধ করবার কেউ নেই।

সে বললে দাঁতে দাঁত পিষে, "তাকে যখন আমি পাব, সে যতবড় বন্ধুই হক, তার বুকটা আমি উপড়ে ফেলব।"

কিন্তু এ শুধু কথা। তারপর?

ছুরিটার তীক্ষ্ণ ধার ওদের তিনজনের মুখেই যেন হিংস্র হয়ে জ্বলতে লাগল। যেন হত্যা-উৎসবের আগে, মন্ত্রপূত অস্ত্রটাকে ঘিরে বসেছে ওরা ট্রাইব্‌দের মত।

আগে ওরা রাগে ও ঘৃণায় যখন কোন কারণে রুদ্র হয়ে উঠত, তখন বিজলী ওদের শান্ত করত। শান্ত না হলে বিজু রেগেছে। বিজু কেঁদেছেও।

আজ বিজু নেই। আজ ওরা সেই মূর্তি ধরেছে।

প্রভাত ছুরি বের করেছে। নরেশ ওর সেই কালো বিশাল শরীরটার পেশীতে পেশীতে ঘষছে। শঙ্করের রক্তাভ বড় বড় চোখ দুটিতে নেশা ধরেছে। যে-চোখ দেখলে বিজু হাসতে হাসতে আঁচলের ঝাপটা মেরেছে। বলেছে "এই রাক্ষস! চোখ করেছে দেখ।" নরেশের পেশীশক্ত শরীর বিজলীর ছোট হাতখানির চাপে কোনদিন নির্দয় দুর্দান্ত হয়ে উঠতে পারেনি।

ওরা প্রতিটি দিনের পাতা উল্টে উল্টে দেখছে, খুঁজছে, পরস্পরের প্রতিটি দিনের ব্যবহার। প্রতিটি দিন, কে কবে কেমন করে হেসেছিল, কতখানি বেশী ঘনিষ্ঠ হতে পেরেছিল বিজুর। কোনদিন কে কতক্ষণ একলা ছিল বিজুর সঙ্গে। বিজু কাকে কবে একটু বেশী স্নেহ করেছিল।

ওদের মনে এই অবিশ্বাস ও সন্দেহের জড় লুকিয়ে ছিল হয়ত। কিন্তু তখন বিজু ছিল। রামধনুর মত কোন কালকূট মেঘকে ঘন হতে দেয়নি। বুক চেপে হাঁটা শ্বাপদ-অন্ধকার পারেনি ফিরে আসতে। আজ ওদের সেই মন হতাশায়, অবিশ্বাস ও সন্দেহে হিংস্র। সেই শ্বাপদ-অন্ধকারটাই গ্রাস করেছে আজ তিনজনকে। তাই প্রতিদিনের উনিশ-বিশ ঘেঁটে ঘেঁটে খুঁজছে ওরা। কে? কে হতে পারে? বিজুর নিশি স্যাকরার আমবাগানের ধারে যাবার আগে, কাল বিকেলেও কে কেমন করে কথা বলেছিল তিন-জনে, সেটাও ভাবছে ওরা। ভাবছে, তিনজনের মধ্যে, কাকে বাঁচাবার জন্যে ঘুণাক্ষরেও কিছু বলে নি বিজু?

একসময়ে নিজেদেরই নিশ্বাসে চমকে উঠে ওরা পরস্পরের দিকে তাকায়। তারপর টেবিলের উপর ছুরিটার দিকে। যেখানে অনেকদিন বসেছে বিজু আর বিজুকে ঘিরে ওরা বসেছে চেয়ারে।

সন্দেহ আর অবিশ্বাস ওদের ছাড়ে না। শেষপর্যন্ত নিজেদের মধ্যে ওরা একটা রক্তারক্তি কাণ্ড করবে। তবু বিজুর প্রতিদিনের স্মৃতি ওদের মাঝে মাঝে আনমনা করে তুলছে।

শংকর হঠাৎ ডাকে, "প্রভাত।"

প্রভাত সন্দেহ করে আগে থেকেই রুক্ষ হয়ে জবাব দেয় "কী ?"

নরেশ তুজনের দিকেই তাকায় তীক্ষ্ণ চোখে।

শঙ্কর বলে "বেচু পাঠক তার বুড়ি দিদিকে খুন করতে চেয়েছিল, মনে আছে ?"

প্রভাত ভ্রূকুঁচকে বলে "তাতে কী ?"

"বেচু পাঠক তোকে দিয়ে খুন করাতে চেয়েছিল সম্পত্তির লোভে। তোকে নগদ তু' হাজার টাকা দিতে চেয়েছিল। বেচু পাঠক দরজা খুলে রাখবে রাত্রে, তুই গিয়ে শুধু বুড়ির গলাটা টিপে রেখে আসবি অন্ধকারে। ব্যস্ আর-কিছুই নয়। এমন কি বেচু পাঠক পরে ধরিয়ে দিতে চাইলেও তোকে ধরবার কোন উপায় থাকত না।"

প্রভাত প্রায় চীৎকার করে ওঠে "কিন্তু তাতে কী হল ?"

শঙ্কর যেন প্রায় চুপি চুপি বলল, "তুই তা করিস্‌নি। বিজু তোকে বারণ করেছিল বলে।"

শঙ্করের গলার স্বরে প্রভাত আর নরেশ যুগপৎ চমকে ওঠে। তুজনেরই চোখে ঘৃণা আর উত্তেজনা ছাপিয়ে একটা নিশি-পাওয়া ব্যাকুলতা ওঠে ফুটে। ওদের তিনজনেরই চোখের উপর ভেসে ওঠে বিজুর মূর্তি।

হ্যাঁ, বিজু প্রভাতকে যেতে দেয়নি বেচু পাঠকের দিদিকে খুন করতে। খুন করার ভয়াবহ নারকীয়তার রূপ ওদের অনুভূতি থেকে বহুদিন বিদায় নিয়েছিল। ওদের সেই অনুভূতিটাকে ফিরিয়ে দিয়েছে বিজু।

যখন ওরা চাকরির জন্য দরখাস্তের পর দরখাস্ত করেছে, ভেঁড়ার পালের মত সর্বত্র লাইন দিয়েছে, চটকলের স্পিনার হওয়ার আশাতেও গিয়েছে ছুটে আর ফিরে এসে হতাশায় অবসাদে পড়েছে ভেঙে, তখন একটিই সৎ ও সত্যিকারের রাস্তা খোলা ছিল, মরা। খবরের কাগজের একটি শিরো-নামাকেই ওরা বাড়াতে পারতো, 'অনাহারের জ্বালায় যুবকের আত্মহত্যা।'.

কিন্তু তা করেনি ওরা। তারই একটা রকমফের জীবনের যত ভয়াবহ অন্ধকার সুড়ঙ্গপথগুলি বেছে নিয়েছিল। কেননা, ওরা দেখেছিল, এ-দেশে ওইটিই প্রশস্ত পথ।

সেই সময়েই বিজুর আবির্ভাব হয়েছিল ওদের জীবনে। সে আগলে দাঁড়িয়েছিল ওই অন্ধকার সুড়ঙ্গগুলি।

সেই সময় দেখেছিল, ওদের রাজেন্দ্রাণীর মুখে ঠিক ওদেরই মত উপোসের ছাপ। তখন থেকে ওরা দু পয়সার বাদাম, চার পয়সার মুড়ি, দু গেলাস চা, বিজুর সঙ্গে ভাগ করে খেয়েছ। অনাহারের মধ্যেও সমস্ত লোভ জয় করেছে ওরা।

প্রভাত গোঙার মত ঘড়ঘড়ে গলায় বলল, "হ্যাঁ, বিজু বারণ করেছিল। বলেছিল, বারণ না শুনলে সে মরবে। বিজু মরবে, তাই আমারও যত ঘেন্না হয়েছিল টাকার লোভে। বিজু বারণ করেছিল। বিজু তোকেও বারণ করেছিল শঙ্কর। দাশু গাঙ্গুলি তোকে পাঁচ শ টাকা দিতে চেয়েছিল, শুধু ওর অপজিট্ পার্টির লিডার কেদার ঘটকের নামে একটা মেয়েমানুষকে জড়িয়ে মিথ্যে বক্তৃতা দেবার জন্য। মানহানির মামলা করলে টাকা দেবার চুক্তি ছিল দাশু গাঙ্গুলির। কিন্তু তুই যাসনি, বিজু বারণ করেছিল।" যেন মাতালের মত স্বরহীন গলায় বলতে থাকে প্রভাত, "বিজু তোকেও বারণ করেছিল নরেশ। ডাক্তার তালুকদার তোকে মাসে তিন শ ' টাকা মাইনের চাকরি দিতে চেয়েছিল, শুধু তার স্মাগলিং-এর কর্নারগুলির উপর নজর রাখবার জন্যে, দলের বিশ্বাসঘাতকদের ওপর স্পাইং-এর জন্যে। সেই চাকরি তুই নিসনি। বিজু তোকে বারণ করেছিল।"

বিজু তাদের বারণ করেছিল, এই কথাটা কাঠের খুপরির মধ্যে আবর্তিত হতে থাকে। বিজু তাদের ঘেন্না করতে শিখিয়েছিল। তাই তারা অন্ধ-সুড়ঙ্গগুলির মুখে পা দিয়ে ফিরে এসেছিল। তাই তারা এ-সংসারের সকল অনাহারীর সাধারণ দলেই এসে ভিড়েছিল। বাঁচতে চেয়েছিল আর সকলেরই মত রোষে ও রাগে, কষ্টে ও কান্নায়।

আর তবু উপোসী বিজু তাদের তিনজনের তিলে তিলে মরা মূর্তিগুলির দিকে তাকিয়ে কখনও চোখের জল চাপতে পারেনি। মুখ নিচু করে, যেন অপরাধিনীর মত বলেছে, হয়ত আমার জন্যে, আমারই জন্যে তোমরা মরছ। হয়ত আমার ভুল হচ্ছে। তোমরা একটু ভাব।

কিন্তু তখন আর ভাববার কিছু নেই। একদিন যে-পথ থেকে ফিরে এসে ওরা বিজুকে ঘিরে ছিল, যেই পথটাকে ওরা ঘৃণা করতে শিখেছিল, বিজু ফিরিয়ে দিতে চাইলেও ওরা ফিরে যেতে পারত না। পারবেও না। কারণ, ঘৃণা শুধু নয়, ওরা একটি ভালবাসাকে পেয়েছিল। একটি বিজুকে পেয়েছিল, যার সঙ্গে ওরা সংসারের লাঞ্ছিতদের হাটের মিছিলে চেয়েছিল শরিক হতে।

তাই রাজন্দ্রাণীর শোক-বিমূঢ় চোখের জল তারা মুছিয়ে দিয়েছে। ওই কালো চোখে দপদপ করে আগুন জ্বালারই তাপ চেয়েছে তারা। মৃত্যুহীন নির্ভয়ের খিলখিল হাসির ঝনঝনায় এ বিশ্ব-সংসার কেঁপে উঠুক, তারা তাই চেয়েছে।

সেই হাসি তাই শেষদিন পর্যন্তও হেসেছিল বিজু। অনেক দ্বিধা-দ্বন্দ্ব-ভয়-দুর্দশাগ্রস্ত জীবনে সেই হাসিটাই তাদের অনেক নির্ভয়ের নিশান হয়ে ছিল।

সেই হাসিটা ছিনিয়েছে কে!

আর কারা ছিল বিজুর জীবনের সব অন্ধিসন্ধির খবর জানতে? অসহায় আর অপমানিত ভদ্রলোক রাধু বাঁড়ুজ্যেকে সপরিবারে তিলে তিলে মরতে দেখেছিল তারা। শুধু তাদেরই তিনজনের জন্যে রাধু বাঁড়ুজ্যে তার আই-বুড়ো মেয়ের কলঙ্কে মাথা নত করেছিলেন। সেই সবচেয়ে বড় কলঙ্কের গুপ্ত তথ্য কী, তা ত শুধু তারা তিনজন আর বিজুই জানত। তারা চারজনেই শুধু জানত, সেই কলঙ্ক ছিল শুধু তাদের চারজনের হাত ধরাধরি করে বাঁচা। তাদের বন্ধুত্ব।

বন্ধুত্বের সেই সুযোগ নিয়ে, কে মেরেছে বিজুকে?

তিন জোড়া চোখের কুটিল সন্দেহ, ঘৃণার দৃষ্টি কেউ কারও উপর থেকে নামাতে পারছে না ওরা।

কিন্তু শত অবিশ্বাস সন্দেহেও, ওদের ক্রোধের আগুনে আর তেমন করে ছুরিটার তীক্ষ্ণধারে চক্‌চক্ করছে না। অবসাদগ্রস্ত মনে শুধু একটা হাহাকার ওদের যেন গ্রাস করে ফেলেছে। শুধু মনে পড়ছে, বিজু ওদের কোথায় যেতে বারণ করেছিল, আগলে রেখেছিল কেমন করে! সর্বনাশীর মত কেমন করে সে তিনটি পুরুষের ছটি থাবার উপরে নিজেকে নিশ্চিন্তে মুক্ত করে দিয়েছিল।

'গণেশকাফে'র ঘরে ভিড় কমে এসেছে। ক্রমেই চুপচাপ হয়ে যাচ্ছে সামনের ঘরটা। রাস্তায় গাড়ি-ঘোড়ার শব্দও কমছে।

নরেশ হঠাৎ যেন ছটফট করে উঠল। ছুরিটা হাতে নিয়ে সে দ্রুত চাপা গলায় বলল, "আমি বলব, একটা কথা বলব।"

শঙ্কর আর প্রভাত দুজনেই ফিরে তাকাল তার দিকে।

নরেশ যেন স্বপ্নাচ্ছন্নের মত শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে বলল, "একদিন, সেদিন তোরা দুজনে ছিলিনে, কোথায় গেছিলি। এই ঘরে, আমি আর বিজু। বিজু হাসছিল, অনেক কথা বলছিল। কিন্তু আমার কী হল, আমি জানিনে।

বিজুর শরীরের দিকে সেই যেন আমি প্রথম তাকালাম। সেই যেন প্রথম জানলাম, বিজুর রূপ আছে, যৌবন আছে, আশ্চর্য সুন্দর তার গঠন। আমি পাগলের মত দুহাতে জড়িয়ে ধরলাম বিজুকে। বিজু যেন একবার কেঁপে উঠে স্থির হয়ে গেল।"

বলতে বলতে নরেশ প্রকাণ্ড শরীরটা নিয়ে যেন হাঁপিয়ে উঠল। কিন্তু কেউ ওকে কিছু বলল না। দুজনেই স্থির তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে আছে নরেশের দিকে।

নরেশ আবার বলল; "জড়িয়ে ধরে আমি বার বার ডাকতে লাগলাম, বিজু—বিজু। বিজুর মুখ আমি দেখতে পাচ্ছিলাম না। তাকাতে আমার সাহসও হচ্ছিল না। কিন্তু একটু পরে, বিজু দুহাত দিয়ে আমার মাথাটা জড়িয়ে ধরল। বলল, 'কী বলছ নরেশ? আমার চোখে বুঝি তখন রক্ত। ফিরে তাকালাম তার দিকে। দেখলাম, মুখে তার হাসি, কিন্তু চোখে জল। সে যে আমার মাথায় হাত দিল, তখুনি আমার কেমন হয়ে গেল! আমি তাড়াতাড়ি হাত সরিয়ে নিলাম। বিজু বলল, 'নরেশ, বাবা কোন-দিন বিয়ে দিতে পারবে না। আমি নিজে যদি করি, কাকে করব, বল? তুমি যা চাইছ, তুমি নিতে পার। শঙ্কর আর প্রভাতকে আমি কী বলব? তুমি কী বলবে?' আমার তখন পালিয়ে যাওয়া কুকুরের মত অবস্থা। আমি দু হাতে মুখ ঢেকে রইলাম। বললাম, 'ক্ষমা কর বিজু, ক্ষমা কর।' বিজু আমার দু হাত ওর কোলের ওপর টেনে নিয়ে গেল। আরও কাছে এল আমার। বলল, 'তুমিও আমাকে ক্ষমা কর নরেশ! তুমি, আমি, প্রভাত, শঙ্কর কেউই আমরা ভিন্ন হয়ে যেতে পারব না আর। তাই কোন দিনই আর আমরা এসব পারব না।'

নরেশ নিশ্বাস নেবার জন্য একবার থামল। আবার বলল, "এই, এই আমার একমাত্র অপরাধ বিজুর কাছে। এই—এই—।"

বলতে বলতে তলিয়ে গেল নরেশের গলার স্বর।

কিন্তু প্রভাত আর শংকরও তখন নিশি-পাওয়া জড়ের মত মুখ ঢেকে বসেছে। ওই একই অপরাধ, ভিন্ন জায়গায় একইভাবে ওরাও করেছে বিজুর কাছে।

একই ভাবে প্রভাত অন্ধকার রাত্রে বিজুকে একা বাড়ি পৌঁছে দিতে গিয়ে সেই গাছতলায় দু'হাতে টেনে এনেছিল কাছে। এইভাবেই, "বিজুর দুটি ঠোঁটের পিপাসায় ছাতি ফেটে গিয়েছিল তার। কিন্তু তার মনে

হয়েছিল, বিজুর ঠোঁট যেন শবের ঠোঁট। ঠাণ্ডা, রক্তহীন, অনড়, শক্ত। পরমুহূর্তেই প্রভাতের বুকের মধ্যে একটা ভয়ংকর সর্বনাশের মত মনে হয়েছিল, বিজুকে চিরদিনের জন্য হারাবে সে। কিন্তু বিজুই তার ঠোঁটের স্পর্শ দিয়ে নির্ভয় করেছিল তাকে। শুধু সেই ঠোঁটে কোন অকূল থেকে ভেসে আসা নোনা স্বাদ ছিল। সেই ঠোঁট নেড়ে সে বলেছিল, 'তা হলে আর দুজনের কাছে আমাকে মরতে হয় প্রভাত।'

একইভাবে এক বর্ষার রাতে, রেলের অন্ধকার ওভারব্রিজের নীচে শঙ্কর বিজুর দুটি হাত চেপে ধরেছিল, সে হাত চেপে ধরার মধ্যে পুরুষ তার কিছুই গোপন রাখতে পারে না। তার বড় বড় চোখ দুটিতে দপ-দপ করে পতঙ্গ পুড়ছিল। বিজু শুধু অপলক চোখে তাকিয়ে ছিল রেল লাইনের দিকে। একইভাবেই সে শঙ্করকে শান্ত করেছিল। একই কথা বলেছিল, সে স্বৈরিণী হলে একই প্রাপ্য তিনজনকে দিতে পারত। তা যখন নয়, তখন বন্ধুত্বকে রক্ষা করার প্রয়াসই বিজুর জীবনে অক্ষয় হয়ে থাক।

বিজু বন্ধুত্বকে রক্ষা করেছিল। ওদের আত্মনাশের আর বন্ধুত্বের দুর্গের অটল প্রহরী বিজু। তবে? ওদের তিনজনের সর্বক্ষণের ছায়া আর কেউ ভেদ করেছিল নাকি? ভেদ করে কোথায় যাবে? বিজুরই কাছে ত? যে-বিজু তাদেরই সঙ্গে মরছিল আর বাঁচছিল। তাদের ফিরিয়ে এনেছিল, বারণ করেছিল, ভালবেসেছিল।

রাত হয়েছে। ঠাস্ ঠাস্ করে 'গণেশ কাফে'র দরজা বন্ধের শব্দ ওদের চলে যাবার নির্দেশ দিচ্ছে। ওরা উঠে পড়ল।

কিন্তু পরস্পরকে কেউ ওরা ছেড়ে দিতে পারবে না।

বাইরের রাস্তা ধোঁয়ায় আর কুয়াশায় আবছা। শীতার্ত পথটা নরকের মত জনহীন আর নিস্তব্ধ।

কালকে ওরা কিছুই না জেনে, ফিরে যেতে পেরেছিল। আজকে ওরা ফিরে যেতেও পারছেনা। বিজুর যে কলঙ্কে শহর ধিক্কার দিয়ে হেসেছে, সেই একই ধিক্কার দিতে গিয়ে, আর সকলের মত বিজুর বাবার চোখের সামনেও এই ত্রিমূর্তিই হয়ত ভেসে উঠবে। চিরকাল কলঙ্কটা তাদেরই জন্য থেকে যাবে।

উত্তরদিকেই চলল ওরা। নিশি স্যাকরার আমবাগানের ধারটাই টানছে যেন ওদের। একজন হনহন করে তাদের পার হয়ে গেল হেঁটে। যেতে গিয়ে লোকটা যেন চমকে গেল তাদের দিকে তাকিয়ে। হঠাৎ যেন থমকে গেল

এক মুহূর্ত। কুয়াশায় অস্পষ্ট দেখা গেল লোকটার উস্‌কো-খুসকো চুল। বড় বড় উন্মাদ চোখ দুটিতে চকিতে যেন একটা ভয়ের ঝিলিকও চমকাতে দেখা গেল। এক মুহূর্তমাত্র। তারপরেই, আরও দ্রুত এগিয়ে যেতে লাগল।

কে? চেনা-চেনা লাগল যেন মুখটা? ব্রজেন না?

মনে হতেই ওদের তিনজোড়া চোখ, চোখাচোখি করল আর ওদের মনের মধ্যে সহসা কেমন চমকে উঠল! যেন কী একটা ঘটে গেল ওদের মধ্যে, আর সেই মুহূর্তেই তিনজনে ছুটে গেল ব্রজেনের দিকে। ছুটে গিয়ে ঝাপিয়ে পড়ল তিনজনেই। মুহূর্তমাত্র সময় না দিয়ে টুঁটি ধরে নিয়ে গেল সামনের সরু গলির মধ্যে।

কেন ঘিরে ধরল তিনজনে ব্রজেনকে, নিজেরাই জানে না। শুধু ব্রজেনের মুখে যেন ওরা কী দেখতে পেয়েছে। দেখতে পেয়ে চমকে উঠেছে। যদি কিছু জানে ব্রজেন, বলুক। ঘোচাক সন্দেহ।

ব্রজেন হাঁপাচ্ছে। এই শীতে ওর একটিমাত্র পাতলা জামার বোতাম খোলা। প্যাণ্টটা জুতো ছাড়িয়ে নেমে গিয়েছে, ধুলোয় লুটোচ্ছে, যেন খুলে পড়বে এখনি। সেটাকে ও ধরে আছে এক হাতে। সারা গায়ে ধুলো মাখা, যেন কোথায় গড়িয়ে এসেছে। ভয় নয়, চোখে ওর অস্থির উন্মাদ অস্বাভাবিক এক চাহনি।

বেসুরো ভাঙা গলায় দ্রুত বলল, "কী, কী চাও তোমরা? বিজু, বিজুর খবর?" বিজু। বিজু। ওই নামটা ওরা কারও মুখ থেকে শুনতে চায় না। দাঁতে দাঁত চেপে ওরা তাকিয়ে রইল ব্রজেনের দিকে। যদিও চোখে ওদের বিস্ময় চাপা থাকছে না। কেবল প্রভাতের হাতে ছুরিটা চকচক করছে। যেন সময় হলেই ঝাঁপিয়ে পড়বে সে।

আবার, একই গলায় আরও তীব্রভাবে বলল ব্রজেন, "বিজুর খবর চাও তোমরা? বিজুর?" বলতে বলতে ওর উন্মাদ চোখ দুটোতে হঠাৎ জল দেখা গেল। আর দু'হাত বাড়িয়ে ধরল প্রভাতের হাত। প্রায় ক্রুদ্ধ গর্জনের সুরে বলল, "তবে মার, মার, আমাকে মার।"

ওরা তিনজনেই যেন দারুণ বিস্ময়ে একটা ভয়ংকর কিছুর কাছ থেকে সরে দাঁড়াল।

ব্রজেনের গলা ক্রমেই অতলে ডুবতে লাগল। তবু অস্থির গলায় বলল, হ্যাঁ আমি সে-ই। আমাকে তাড়াতাড়ি মার, মেরে ফেল। আমি, আমি সে-ই। আমি তাকে তিন মাস আগে সাত শ টাকা দিয়েছিলাম। সে আমার কাছে

এসে চেয়েছিল। নইলে তার বাপকে, তার মা-ভাইবোনকে বাড়িওয়ালা এক রাত্রে বাইরে বার করে দিত। দু'বছরের বাড়িভাড়া, আমি তাকে দিয়েছিলাম একটা সর্তে। যে-সর্তে আমি তার পেছনে ছায়ার মত ঘুরেছি। ছায়ার মত।"

ওরা তিনজনেই যেন ওঁত পেতে দাঁড়াল ব্রজেনকে টুকরো টুকরো করবার জন্য। ব্রজেনের গলা সহসা আরও চড়ল। বলল, "মার প্রভাত, শঙ্কর, নরেশ মার আমাকে। আমি সেই, বিজু যাকে সবচেয়ে বেশী ঘেন্না করত, যার কাছে শুয়ে তাকে মরার যন্ত্রণা পেতে হয়েছিল। যার ঠোঁটে, মুখে সে থুথু দিয়েছিল, অভিশাপ দিয়েছিল। তবু তার নিজেকে বিলিয়ে দিতে হয়েছিল; আমি সেই, যে তাকে তবু লোভীর মত ছিঁড়ে খেয়েছে, অনেকদিনের লালসায়। আমি সেই, যে তাকে শেষবারের মত মেরেছে। মার, মার আমাকে।"

কিন্তু খুনের নেশা কোথায় গিয়েছে তিনজনের। একটা অবিশ্বাস্য ভয়ংকর কাহিনী শুনে তিনজনেই যেন চলচ্ছক্তিরহিত, বিহ্বল হয়ে গিয়েছে। শুধু একটা উন্মাদ জন্তু, তাদের কাছে হাঁটু গেড়ে বসে মৃত্যু ভিক্ষা করছে।

মৃত্যু ভিক্ষার আর্তনাদ ওরা শুনছে, কিন্তু এখনও যেন সেই বিজুই ওদের হাত ধরে রেখেছে, যে তাদের সব পঙ্কিলতা আর পাঁশ থেকে ফিরিয়ে এনেছে। মনে হল, ব্রজেনকে খুন করার নিষ্ঠুরতাকে বিজুই যেন দুহাত দিয়ে আগলে ধরে রেখেছে। ওরা দেখল, সেই পাঁশ-আস্তীর্ণ ত্রিভুজের ভিটেটায় এখনও ফুলটা ফুটে আছে, অম্লান।

সহসা ব্রজেনের গলার স্বর মোটা আর স্পষ্ট শোনাল। বলল, "মারতে পারলে না তোমরা। আমি কাল রাত্রি আটটা থেকে চব্বিশ ঘণ্টা বাঁচবার আপ্রাণ চেষ্টা করেছি। ঘুরেছি, সে বেঁচে থাকলে আজীবন তার পিছে পিছেই ঘুরতাম।"

আবার ওর চোখে সেই উন্মাদ ভাব পুরোপুরি ফিরে এল। প্যাণ্ট হেঁচড়ে হেঁচড়ে টলতে টলতে চলে গেল। গেল সামনের ঝুপসি জঙ্গলের দিকে।

ওরা তিনজন তখনও তেমনি দাঁড়িয়ে। তখনও ওদের নড়বার ক্ষমতা ছিল না। হয়ত ব্রজেন রেল-লাইনে মরতেই গেল। যাক। ওরা ফেরাতে যাবে না। কারণ, ওদের বুকের মধ্যে তখনও ফেটে পড়ার একটা ভয়ংকর যন্ত্রণা টনটন করছে। তিনটি বুকে বিজুই তখন ফিস্‌ফিস্ করে যেন বলছে, কেন, কেন বিজু মরেছে?

শোভাবাজারের শাইলক

শোভাবাজারের শাইলক, এই নামেই তাকে সবাই চিনত। চিনত নয়, এখনো তাই চেনে। আর যতদিন বেঁচে থাকবে ততদিনই চিনবে।

কারণ, এই নামটাই তার আসল পরিচয়। তার চরিত্রের ভিতর এবং বাইরের, সবটুকু মিলিয়েই, এই সার্থক নামটা লোকে তাকে দিয়েছে। লোকেরা তাদের অভিজ্ঞতা থেকেই দিয়েছে।

কারণ তারা দেখেছে, সেকস্‌পিয়রের নাটকের চরিত্র ইহুদী শাইলক, যেমন তার খাতকের দেহের মাংস দাবী করেছিল পাওনা টাকার জন্য, আমাদের শোভাবাজারের শাইলকের চরিত্রে সেই নিষ্ঠুরতাই বর্তমান। যদিও পাওনা টাকার জন্যে সে খাতকের মাংস আর দাবী করতে পারে না, কেন না, যুগটা বদলে গিয়েছে। তবু এটা ঠিক যে, পাওনা টাকার বদলে টাকা না পেলে মাংসতেও সে নারাজ নয়।

শোভাবাজারে অবশ্য একে আপনারা বড় একটা দেখতে পাবেন না। সেখানে কোন একটি কানাগলির সুড়ংগের মধ্যে মান্ধাতা আমলের মস্তবড় রাক্ষুসে বাড়িতে সে রাত্রিবাস করে শুধু। যে বাড়িটার ঘরগুলি এখন অজস্র অন্ধ-গহ্বর বলে মনে হয়, আর সব তছনছ করা উচ্ছৃঙ্খলতার মত যার গায়ে বট অশ্বত্থেরা মাথা তুলেছে, একই পায়রারা বংশ পরম্পরা যার খিলানেকোটরে জন্ম-মৃত্যুর লীলা-খেলা করে।

কিন্তু যে-হেতু সে শোভাবাজারের বাসিন্দা, সেই হেতু তাকে শোভা বাজারের শাইলক বলা হয়। যদিও সে শোভাবাজারের আদি বাসিন্দা নয় এবং তার আদি যে কোথায়, সে বিষয়েও সঠিক কোন সংবাদ কেউ জানে না। তবু শোভাবাজারের সবাই তাকে চেনে। আর চেনেও অনেকদিন থেকেই; যখন সে বাঁক কাঁধে করে গঙ্গার জল সরবরাহ করত বাড়িতে বাড়িতে।

তখন এ অঞ্চলের প্রায় সব বিধবা এবং বুড়ী সধবা গিন্নীরাই তাকে চিনতেন। বিশেষ, যারা ঠাকুরঘরের বাইরের জগতকে চিনতেন না। আর যে টুকু চিনতেন সেটুকু গঙ্গাজলের ছিটে দেওয়া চৌহদ্দিটাকেই চিনতেন।

তখন তাঁদের মুখে একটি কথা শোনা যেত প্রায়ই, এই মুখপোড়া ঘটে ছি-চরণের পাঁকগুলো ধুয়ে বাড়ি ঢুকতে তোর কি হয় রে, অ্যাঁ ?

এই ঘটে থেকে তার একটা পুরো নাম আবিষ্কার করা যদিও খুবই মুশকিল, তবু আমার মনে হয়, তার নাম ঘটোৎকচ হওয়াই স্বাভাবিক। কারণ, এখন যেখানে সে চাকরি করে সেখানে, অবিশ্বাস্য হলেও তার নাম লেখা আছে, রাবণ হালদার। এই নাম এবং পদবী, দু'টি জিনিসই অবশ্য খুব গোলমেলে। এই জন্যেই গোলমেলে যে, সে নিজেকে পোদ্ জাতের লোক ব'লে পরিচয় দেয়, যাদের আর যাই হোক, বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদের হালদার পদবীটা হওয়া অস্বাভাবিক। আর নাম ? সে বিষয়ে সবাইকে এই ভেবেই নীরব থাকতে হয় যে, পৃথিবীতে কত বিচিত্র নাম-ই না আছে !

কিন্তু বেছে বেছে, আমাদের শোভাবাজারের শাইলকেরই কি এই নামটা রাখা হয়েছিল ? কী বিচিত্র !

চাকরির কথাটা বলে নেওয়া দরকার। কেন না, প্রশ্ন উঠতে পারে, সুদখোরের আবার চাকরি কিসের? চাকরি একটা সে করে, সেটা তাকে তার আসল ব্যবসায়ে অনেক এগিয়ে দিয়েছে।

কাছাকাছি একটি হাই-স্কুলের সে বেয়ারা। গঙ্গাজলের পুণ্য-ব্যবসা করতে করতেই এই চাকরিটা সে কোন এক কালে পেয়েছিল। সেটা এখন কোন এক কালেই পৌঁছেছে এই জন্য যে, পঁচিশ বছরের ওপর সে এই স্কুলে আছে। ইতিমধ্যে তিনবার প্রধান শিক্ষক বদল হয়েছে। অনেক নতুন শিক্ষক এসেছেন, পুরনো শিক্ষক গেছেন। মারাও কিছু কম যায়নি।

তার আগে সে গঙ্গাজল দিত বাড়ি বাড়ি। আর সেই গঙ্গাজলের পুণ্যের-ব্যবসার সময়েই সে প্রথম একজনকে ধার দেয়।

সেটাও খুব অদ্ভুত ব্যাপার, অন্তত শাইলক-জীবনের প্রথম অঙ্কুরোদ্গমের কাহিনীটা জানা যায়।

সে যে বাড়িটায় তখনো ছিল, এখনো আছে, সেখানে অনেকেই তার মত। নানান ফিকিরেই তাদের পেট চলত।

শাইলকের, হ্যাঁ শাইলক বলাই ভাল; শাইলকের হাতে সেদিন একটি মাত্র টাকা আছে, সেটা ভাঙিয়ে তাকে খেতে হবে।

ওই বাড়ীর পরিচিত একজন তার কাছে একটা টাকা ধার চেয়েছিল। কিন্তু টাকা মাত্র একটি। দেওয়া যায় না। তা' ছাড়া টাকা দেবার কোন ইচ্ছাই তার ছিল না।

লোকটা তবুও বিরক্ত করছিল, কারণ, তার একটু নেশা ভাং-এর ব্যাপার ছিল। লোকটা প্রায় পায়ে পড়ে বলেছিল, চার পয়সাটা বেশী হয়, কিন্তু রাত পোহালেই টাকার সঙ্গে পুরো দু'টি পয়সা সুদ দেবে।

কথাটা তার মনে ধরেছিল এবং মনে মনে ভয় থাকলেও টাকাটা দিয়েছিল সে তাকে। যদিও রাত্রে সে তার জন্য উপোস করেছিল, তবু দেখতে চেয়েছিল, পুরো টাকাটার সঙ্গে তার আরো দুটি পয়সা আসে কি না।

এসেছিল। পুরো এক ইঞ্চি ডায়মেটারের রাজা-মার্কা তামার নতুন দু'টি পয়সাই পেয়েছিল সে। সেই দিনটা এবং পয়সা দুটি যে কত বড় ঐতিহাসিক ব্যাপার, সেদিন সেটা বোঝা যায়নি। কেউ জানেও না।

শাইলকের বাড়ি কোথায়, আছে কে কে, বিয়ে-থা হয়েছিল কি না, ছেলেমেয়ে আছে কি না, এসব প্রশ্ন শাইলকের জীবনে মৌন সমুদ্রের মতই নীরব। সেখানে কোনদিন বুড়বুড়ি কাটার মতো একটি দুর্বোধ্য শব্দও শোনা যায়নি।

তার এখনকার পরিচিতদের ধারণা, লোকটা আবহমান কাল ধরেই এক রকম দেখতে। রোগা নয়, পেটা-পেটা গড়নের একটি শক্ত কালো মানুষ, বয়সের যার গাছপাথর নেই। বয়স পঞ্চাশ হতে পারে, পঁয়ষট্টি হওয়াও কিছুমাত্র বিচিত্র নয়! টাক নেই, ধূসর বর্ণের ছোটছোট খোঁচা খোঁচা চুল, যার কখনোই যেন বাড় নেই, পরিবর্তন নেই। মোটা স্ফীত নাক, ছোট চোখের ওপরে মোটা লোমশ ভ্রূ-জোড়া হুমড়ি খেয়ে পড়েছে যেন। সেই একই মার্কিন কাপড়ের হাফসার্ট আর আট হাত মিলের ধুতি কোঁচা দিয়ে পরা। পায়ে সে কোনদিনই জুতো দেয়নি। নেশার মধ্যে শুধু চা।

স্কুলের অধিকাংশ মাস্টারমশাই তাকে খাতির করেন। মনে মনে রাগ এবং ঘৃণা থাকলেও ভয়ও করেন। কারণ, তাঁদের মাসের শেষ থেকে নয়, গোড়া থেকেই ধার দেবার লোক এই শাইলক। তাঁদেরই বেয়ারা।

কবে থেকে তার শাইলক নাম হয়েছে, সেটাও এখন অতীত কালের ঘটনা। সবাই তাকে ওই নামেই ডাকে। সে কিছু মনে করে না।

কেবল হেড-মাস্টারমশাই তাকে রাবণ বলে ডাকেন। শাইলকের নিজেরও ওই নামটা মনে থাকে না, তাই জবাব দিতে ভুল হয়ে যায় মাঝে মাঝে। হেড-মাস্টার রাবণ বলেন এই জন্যে যে, অন্তত শাইলক তাহলে তাকে খাতির করবে। আর বোধহয় সেই জন্যেই শত প্রয়োজনেও তিনি কখনো শাইলকের কাছে ধার করেন না।

শাইলক মাষ্টারমশাইদের সব সময়েই প্রায় ধমকে কথা বলে। সে অধিকার তার আছে এবং তার ধমকটা সবাই মেনেও নিয়েছেন।

যেমন, বাংলার মাস্টার হরেনবাবু, হয় তো ক্লাসে না গিয়ে তখনো বিড়িতে সুখ টান দিচ্ছেন, ঘণ্টা বেজে গিয়েছে পাঁচ মিনিটের ওপর।

শাইলক ব'লে উঠল কই হরেনবাবু, বিড়ি তো অনেকক্ষণ ধরে খাচ্ছেন, এদিকে এইটের বাঁদরগুলি যে লঙ্কাকাণ্ড করছে। তাড়াতাড়ি যান।

হরেনবাবুর রাগ হবার কথা। হেড-মাস্টার কিছু বলছেন না। আর বেয়ারা এসে হুকুম করবে? কিন্তু হরেনবাবু রাগ করবেন কেমন ক'রে? আসল দূরের কথা, এ মাসের স্থদটা পর্যন্ত দেওয়া হয়নি এখনো।

কিংবা, ইংরেজীর মাস্টার অনিলবাবুকে ডেকে শাইলক হয় তো বলল, ও অনিলবাবু শুনুন, কোঁচাটা মাটিতে লুটোচ্ছে মশাই। ওই করেই ওই কাপড় ছেঁড়েন, আর মাসে মাসে ধার ক'রে তাই কাপড় কিনতে হয়।

অনিলবাবুর মনের অবস্থা বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন।

কিন্তু তিনি শাইলকের একজন খাতক।

এসব তো খুবই ভাল কথা। এর চেয়ে অনেক খারাপ খারাপ কথাও সে বলে। অঙ্কের মাস্টারমশাই রামকৃষ্ণবাবুকে তো রীতিমত অঙ্কই শিক্ষা দিয়ে দেয় সে অনেক সময়। বলে, দেনার হিসেবে এত ভুল করেন, রামকেষ্টবাবু, ছাত্রদের আপনি যা পড়াবেন তা আমার জানা আছে। যাক, ভুল করুন আর যা-ই করুন, আমার দু'টাকা তের আনা এক পয়সা স্থদটা দিয়ে তারপরে যা খুশি তাই করুন গে।

প্রায় অধিকাংশ মাস্টারের ওপরেই তার খবরদারি চলে, হেড-মাস্টারকে ছাড়া। তিনি শাইলকের কাছে ঋণ করেন না।

তবু মাস্টারমশাইদের ওপর খবরদারি করে করে, সকলের সঙ্গে সমান সমান কথা ব'লে, এমন একটা পর্যায়ে এসে পড়েছে যে, মনে হয় স্কুলে ওর ওপর কেউ নেই। আর যা খুশি তাই করতে আর বলতে পারেও!

এই তো গত মাসে স্কুলের ইনস্পেক্টর এলেন। শাইলক তো অনেক মাস্টার মশাইকেই সেদিন ধমকালে। তারপর ইনস্পেক্টর যখন এলেন, শাইলক আগে বেড়ে পরিচয় করিয়ে দিল। এই যে, ইনিই আমাদের হেড-মাষ্টারমশাই। ইনস্পেক্টর নমস্কার করলে, হেড-মাষ্টারও। কিন্তু রাগে হেড-মাষ্টার মশাই-এর গা জ্বলতে লাগল। তখন কিছু বলতেও পারলেন না।

শুধু তাই নয়, শাইলক সব মাস্টারের পরিচয় করিয়ে দিলে। ইনি অঙ্কের মাস্টারমশাই রামকৃষ্ণবাবু, ইনি বাংলা···ইত্যাদি।

সবশেষে, এই কুদর্শন, উঁচু করে কাপড় পরা, হাফসার্ট গায়ে, খোঁচা খোঁচা চুল শাইলককে ইনস্পেক্টর জিজ্ঞেস করলেন, আপনার পরিচয়টা তো দিলেন না?

শাইলক খুব গম্ভীর ভাবেই জবাব দিলে, আমি এ স্কুলের বেয়ারা।

ইনস্পেক্টর অবাক হ'য়ে তাকালেন হেড-মাস্টারের দিকে। হেড-মাস্টারের মুখ তখন লাল। খালি বললেন, রাবণ, তুমি বাইরে গিয়ে বসো।

শাইলক বাইরে গিয়ে বসল।

ইনস্পেক্টর চলে যাবার পর হেড-মাস্টার তো প্রায় মারতেই যান শাইলককে, গেট আউট, এখুনি বেরিয়ে যাও স্কুল থেকে।

অপরাধটা যে গুরুতর হয়েছে, সেটা বুঝতে পেরে, নরম করে জবাব দিলে শাইলক, আলাপ করিয়ে দিলে যে অপরাধ হয়, তা' জানতুম না। ঠিক আছে, আর এ রকম হবে না কোন দিন।

এমন কিছু হাতে পায়ে ধরে বলেনি শাইলক, কিন্তু ওইটুকু বলাই তার পক্ষে যথেষ্ট।

শুধু সেইদিনটিই কোন মাস্টারমশাইকে আর সারাদিন সে ধমকায়নি।

কিন্তু এ জায়গাটা শাইলকের আসল ব্যবসার স্থান নয়। সেটা অন্যত্র এবং সেখানেই তাকে সবচেয়ে ভাল ক'রে চেনে সবাই। আর সেখানে কেউ মাস্টারমশায়ও নয়। সকলেই নীচু শ্রেণীর লোক।

তাই, স্কুলের শেষ ঘণ্টা বাজিয়ে, দারোয়ানের ওপর সব ভার দিয়ে সে গিয়ে বসে খালধারের সেই চায়ের দোকানটায়।

সেখানে তার একটি নির্দ্দিষ্ট আসন আছে। চায়ের গেলাস নিয়ে সেখানে ব'সে, তার মোটা ভ্রুর তলায় প্রায় ঢাকা ছোট ছোট চোখে তাকিয়ে থাকে পশ্চিমাকাশের দিকে।

জায়গাটা সে ইচ্ছে করেই ওখানে বেছে নিয়েছে। কারণ পশ্চিমদিকটা অনেকখানি খোলা, আর গঙ্গাকে দেখা যায়। গঙ্গার ওপার পর্যন্ত। সেখানে বসে বসে সে সূর্যাস্ত দেখে।

না, কোন বিশ্বরহস্যের অনির্বচনীয়তাকে প্রত্যক্ষ করার জন্য এই সূর্যাস্ত দেখা নয়। তার খাতকের দলেরা দেনা মেটাতে আসবে এবং সূর্যাস্ত হলেই সুদ এক পয়সা করে বেড়ে যাবে।

তার এই আসল খাতকেরা সকলেই বাজারের ফড়ে। আশে পাশে অনেকগুলি বাজারের ফড়েরাই তার দেনাদার। যারা টাকা পিছু প্রতিদিন এক পয়সা ক'রে সুদ দেয়।

সন্ধ্যাবেলা টাকা নেবে, পরদিন সূর্যাস্তের আগেই সুদসহ টাকা শোধ না হ'লেই আবার সুদ। ঘড়ি ধ'রে এখানে কারবার চলে না। গঙ্গার ওপারে, গাছের আড়ালে সূর্য হারিয়ে যাওয়া মানেই দিন শেষ। অতএব এক টাকার শোধ আর, এক টাকা এক পয়সা নয়—ছু' পয়সা।

ফড়েরা অধিকাংশই রাত্রে পাড়াগাঁয়ের দিকে, দূর গ্রামের হাটে তরি-তরকারি কিনতে যায় পাইকারি দরে। তখনই তাদের টাকার প্রয়োজন হয়। পরদিন বাজারের বিক্রি-বাটা শেষে লাভ লোকসানের বরাত দেখে তারা।

যারা শাইলকের কাছে ঋণী, তারাও বেলা চারটে থেকেই আকাশের দিকে তাকাতে থাকে। একবার সূর্য পাটে গেলেই হয়, দশ টাকার সুদ পাঁচ আনা দিতে হবে।

অবশ্য এর মধ্যে কতকগুলি ফাঁক আছে। যথা, খাতকের ভিড় হয়েছে, সকলের সঙ্গে হিসেব মিটমাট করতে করতেই সূর্যাস্ত হয়ে গেল। যারা তখনো বাকী, তাদের বাড়তি সুদ দিতে হবে না, কারণ তারা সূর্যাস্তের আগেই এসেছে। এসেছে কি না সেটা অবশ্য লক্ষ্য রাখে সে।

বেলা ছ'টোর আগে ব্যাংকে চেক জমা দেবার মত। এটা শাইলক ওখান থেকে শিখেছে। এইসব খাতকদের মধ্যে মেয়ে-পুরুষ সবরকমই আছে। আর শাইলকের ব্যবহার সকলের সঙ্গেই সমান।

তাই সে বেলা চারটার সময় এসে, খালধারের চায়ের দোকানে বসে। কোলের ওপরে থাকে তার সেই ময়লা মোটা খাতা, আর সুতো দিয়ে বাঁধা পেন্সিল। যে পেন্সিলের শিস্‌টা তার লেখার চেয়ে, জিভে ঠেকিয়ে ঠেকিয়েই বেশী ক্ষয়েছে।

খাতা খুলে প্রত্যেকের হিসেব দেখে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। লেখাগুলি তার নিজেরই এবং সেগুলি সে নিজে ছাড়া কেউ পড়তে পারে না। হিসেবের পাশে নানারকম সাঙ্কেতিক চিহ্নগুলিও সে ছাড়া আর কেউ বুঝবে না।

প্রত্যেকটি পয়সা সে গুণে নেয়, থু থু দিয়ে খাতার পাতা উল্টে বকেয়া সুদের হিসেব দেখে নেয়। আর ঘন ঘন আকাশের দিকে তাকায়।

আকাশের দিকে চেয়ে চোখ ফিরিয়ে, খাতকের দিকে তীক্ষ্ণ অনুসন্ধানী

দৃষ্টি মেলে ধরে। কে কে আসেনি এখনো? মনে থাকে ঠিক। অভ্যাসও হয়ে গেছে।

রেহাই ব'লে কোন কথা নেই। মাফ ব'লে শব্দটা নেই শাইলকের অভিধানে।

যদি কেউ বলে, দেখ শালিক খুড়ো—

সেটাও আবার একটা কথা। তাই এইসব খাতকেরা তাকে শালিক বলেই ডাকে। শাইলক কথাটার মানে তারা জানে না। কিন্তু শব্দটা শুনে শুনে, 'শাইলক' তাদের ধারণা ও উচ্চারণে 'শালিক' হয়ে গেছে।

তাতে শাইলক কিছু মনে করে না।

যদি কেউ বলে, শালিক খুড়ো আজকে যদি একটু মাফ ক'রে দাও, অবিশ্যি কালই দিয়ে দেব, তবে আজকের রাতটা ছেলেমেয়ে নিয়ে খেয়ে বাঁচি।

—তোমার খেয়ে বাঁচার জন্য আমি টাকা দিইনে।

তা' বটে। সূর্যাস্তের পরমুহূর্তে এসে হাতে-পায়ে ধরেও ডবল সুদ থেকে কেউ রেহাই পায় না। দৈবাৎ কারুর বাড়িতে যদি কেউ মারা যাবার জন্যও না আসতে পারে, তাকেও ছেড়ে দিতে দেখা যায়নি শাইলককে। মৃত খাতকের পয়সাও সে আদায় ক'রে ছাড়ে। অবশ্য মৃত্যুর পর প্রতিদিনের বাড়তি সুদটা শাইলক আর ধরে না। একবার পাঁচী ফড়েনী দু'টি আস্ত ফুলকপি দিয়েছিল শাইলককে। পাঁচীর দেনাটা একটু বেশী ছিল। সুদটাও বেশী। এবং আসতে রাত হয়েছিল। তাই বোধ হয় পাঁচীর ফুলকপির উপহার। ফুলকপি নিলেও সুদের একটি আধলাও ছাড়েনি সে।

মৃত্যু শোক দুর্ঘটনা, কোন কিছুই এই শোভাবাজারের শাইলককে কোনদিন টলাতে পারেনি। সূর্যাস্ত দেখতে ভুল করেনি সে কোন কারণেই কোনদিন এবং সূর্যাস্তের পর হিসেবের কড়ি একটিও ছাড়েনি।

যারা তার খাতক, তাদের কোন উপায় নেই তার কাছে না এসে। কেন না প্রতিদিনের প্রয়োজন মেটাবার মত লোক পাওয়া বড় কঠিন। তা'ও আবার ভাল লোক। কিন্তু মনে-প্রাণে সবাই তাকে ঘৃণা করে। পয়সার প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও তার মৃত্যু কামনা করে সবাই। এবং সকলের দৃঢ় বিশ্বাস, লোকটা মরলে, শকুনে ছিঁড়ে খাবে তাকে। আর খুব সম্ভবত লোকটা গলায় রক্ত-উঠেই মরবে।

তার সেই মৃত-চেহারাটা ভাবতেও অনেকের ভাল লাগে বোধ হয়।

এ-হেন শোভাবাজারের শাইলক এক অদ্ভুত কাণ্ড ক'রে বসল।

হাতিবাগান বাজারের তরকারিউলী বিধবা সুখদার বয়স বছর বিয়াল্লিশ হবে। দেখতে সে তেমন ভাল নয়, তবে এ বয়সেও তার দেহের বাঁধুনিটা ছিল ভালই। মুখখানি মোটামুটি যদিও, তবু একটা চটক ছিল। রাস্তা দিয়ে গেলে একবার তাকিয়ে দেখবে সবাই তাকে।

শাইলকের সে খাতক। যদি বা কোন দিন সুখদা ভ্রূ নাচিয়ে থাকে শাইলকের দিকে চেয়ে, একটু বেশী হেসে-টেসেও থাকে, তাতে কোন দিনই তার কিছু যায় আসেনি। এবং সে সব দেখেও একটি আধলাও মাফ করেনি।

সুখদা একদিন তার ষোল বছরের মেয়েটিকে নিয়ে এসেছিল সঙ্গে। আর সুখদা সেইদিন লক্ষ্য ক'রে দেখেছিল, 'শালিক' তার মেয়ে ময়নাকে বারে বারেই দেখছে।

ময়না বয়সে ষোলই বটে। কিন্তু একটু বড়সড়ো হয়ে পড়েছে। যে পাড়ায় তারা থাকে, সেটাও ভাল নয়। মেয়েটিকে নিয়ে নানান দুর্ভাবনা সুখদার। শিস্ দেওয়া, গান গাওয়া তো অষ্টপ্রহর আছেই। মেয়েকে কাছে কাছে নিয়ে না ঘুরলে, এক মুহূর্ত সে স্থির থাকতে পারে না। এক মিনিট কারুর দিকে বেশী তাকিয়ে থাকলে, ময়নাকে চিমটি কেটে তার সম্বিত ফেরায় সুখদা: ওদিকে কি দেখছিস্?

ময়না সুখদার গলার কাঁটা। কিন্তু বিয়ে দেবার যোগ্যতা নেই সুখদার।

কথাটা শাইলকেরও অজানা নেই।

কিন্তু, 'শালিকের' দৃষ্টি দেখে সুখদার মনে বিচিত্র ইচ্ছা জেগেছে। শাইলককে জামাই করলে মন্দ হয় না। রূপকথার মতই যার টাকার আণ্ডিল, তাকে বাঁধবার তবু একটি রাস্তা আছে তার। বয়স? টাকার কাছে কিছু নয় ওটা। পুরুষের আবার বয়স!

একদিন সে বলেই বসল, মেয়েটাকে আর ঘরে রাখতে পাচ্ছিনে শালিক-দা।

শাইলক বললে, বে' দাও।

—টাকা?

—কত টাকা?

সুখদার বুকের মধ্যে বুঝি কাঁপছিল। এ রকম জিজ্ঞেস করার মানে? বিনা সুদে তাকে ধার দেবে নাকি?

সুখদা বলল, তা, একটা বে' থা দিতে গেলে আজকালকার দিনে পাঁচশো তো লাগেই।

—হুঁ।

কথার ফাঁকে একবার সূর্যাস্ত দেখে বলল শাইলক, মেয়ের বে' দিতে চাও? ওই ময়নার? ছেলে দেখেছ?

দেখা ছিল সত্যি। ভাল পাত্র, শিয়ালদহ বাজারে বেশ ভাল দরের দোকানদার। কিন্তু শাইলক যে তাকে ছলনা করছে না, তার প্রমাণ কি? সুখদা কি বোঝে না, ছেলে সে নিজেই হ'তে চায়। তবু একবায় চাব্‌কে দেখতে আপত্তি কিসের?

বলল, দেখেছি।

—ভাল?

—খুব ভাল।

—হুঁ। মেয়েটি তোমার ভাল সুখদা। দেখতেও ভাল। মেয়েটিকে আমার ভাল লেগেছে।

কেমন ভাল। সেইটিই জানতে চায় সুখদা। বলল, সে তোমার দেখবার চোখ শালিক-দা।

হুঁ। মেয়েটি তোমার সুখী হোক, এটা আমি চাই সুখদা।

কারুর সুখ চায় শাইলক?

শাইলক হঠাৎ বলল, টাকা তোমাকে দেব সুখদা।

—এত টাকা ধার, শুধব কেমন ক'রে শালিক-দা?

শাইলক পশ্চিমাকাশের দিকে তাকাল। ভ্রূ'দুটি তার উঠে গেছে, চোখ দু'টি শান্ত আর বড় দেখাচ্ছে। গম্ভীর গলায় বলল, ধার নয়। তোমার মেয়ের বে'র জন্যে দেব। পাঁচশো টাকাই দেব। ছেলেকে পাকা দেখে বে'র দিন ঠিক কর। এই জ্যৈষ্ঠতেই লাগাও।

সুখদা হাঁ ক'রে তাকিয়েছিল শাইলকের দিকে।

শাইলক বলল, তোমার আজকের টাকা আর সুদটা দাও।

সুখদা টাকা আর সুদ দিয়ে বলল, ময়নার বে'র কথাটা মিছিমিছি নয় তো শালিক-দা?

শাইলকের মুখটা ভীষণ দেখাল। ঝেঁজে উঠে বলল, মিছে কথা কোন দিন বলতে শুনেছ শালিককে?

সুখদা ব্যবস্থা করলে মেয়ের বিয়ের। দিন ঠিক হল।

পাঁচশো টাকা নিজের হাতে রেখে, শাইলক প্রতিদিন সুখদার দরকার অনুযায়ী টাকা দিতে লাগল।

কেউ সুখদাকে ভয় দেখাতে লাগল। কেউ কেউ খারাপ কথাও বলতে কসুর করল না। আর সেই কলঙ্কের হাত থেকে মা-মেয়ে, কেউই বাদ গেল না।

তবু, মেয়েমানুষ পাওয়াটা এমন আর কি কঠিন ব্যাপার ছিল শাইলকের পক্ষে? কিন্তু পাঁচশো টাকা?

শাইলকের দিকে সবাই অবাক চোখে তাকাতে লাগল।

তারপরে এল সেই বিয়ের দিন। পাঁচশো'র সব টাকাই শাইলক দিয়ে দিলে সুখদাকে।

বিয়ে হল। নিমন্ত্রিতদের মধ্যে সুখদা তার চেনাশোনা অনেক ফড়েকেই নিমন্ত্রণ করেছে। আর তারা সকলেই শাইলকের খাতক।

বিস্ময় ও সন্দেহের নানারকম ভ্রূকুটি চারদিকে। শাইলককে ঘিরেই। শুধু সুখদা আর ময়নার বিস্ময়েরই সীমা ছিল না।

সকলের সঙ্গে বসে খেল শাইলক। তারপর একখানি শিল্কের শাড়ি বের ক'রে দিল ময়নাকে। বললে, নাও-মা।

সুখদা কেঁদেই ফেললে। ময়না নমস্কার করল।

যাবার আগে, সুখদাকে আড়ালে ডেকে শাইলক বলল, তিনদিন ধরে তোমার বকেয়া সুদ বাকী রয়েছে কিন্তু, সেই সাড়ে সাত টাকার, মনে আছে?

অবাক হ'য়ে সুখদা বলল, হ্যাঁ।

—দেরী করছ কেন? সুদ রোজ বাড়ছে। কাল দিয়ে দিও।

লোকটা কিছু ভোলে না; যে পাঁচশো টাকা দিয়ে সুখদার মেয়ের বিয়ে দিয়ে দেয়, সেইলোক সাড়ে সাতটাকার সাড়ে সাত আনা সুদের তাগাদা দিতে ভোলে না।

শাইলক বেরিয়ে যাবার পরেই, কয়েকজন ফড়েও বেরিয়ে গেল।

তারপর সুখদার বাড়ী থেকে বেশ খানিকটা দূরে, অন্ধকার খালের ধারে, একটি পুলের তলায়, হঠাৎ কারা যেন আক্রমণ করলো শাইলককে। প্রচণ্ড-ভাবে মারল তারা লোকটাকে, আর শুধু এইটুকু শোনা গেল, শালা এতদিনে বুঝেছি, তুমি মাগীর পেছনে টাকা খাটাও, গরীবের টাকা মার।

পরদিন কথাটা রাষ্ট্র হ'য়ে গেল ঝড়ের বেগেই যে, শাইলককে নাকি কারা মেরেছে।

স্কুলের মাস্টারমশাইরা দেখলেন। শাইলকের ফোলা কাটা ক্ষত বিক্ষত মুখ। সে মরেনি। তাঁরা হাসলেন ঠোঁট টিপে।

সেদিন খালের ধারে চায়ের দোকানে তার খাতকের দলও বিশেষ নজরেই তাকিয়ে দেখল তার দিকে।

কিন্তু শাইলকের ব্যবহারে কোন তফাত দেখা গেল না। কেবল জনা পাঁচেক ফড়েকে সে বলল, গ্যাখ্, সংসারে পাপ এখনো আছে। তোরা কখনও মুক্তি পাবিনে, আমারো মুক্তি নেই।

এছাড়া আর কিছু সে বলেনি।

তারপরে পাঁচ বছর কেটে গেল, সেই একই লোক রয়ে গেছে শাইলক। কোন পরিবর্তনই হয়নি তার।

শুধু সুখদা এবং সকলের কাছেই, ময়নার বিয়ে দেওয়াটা শাইলকের জীবনের মৌনসমুদ্রে কয়েকটি দুর্বোধ্য বুদবুদের মতই রয়ে গেল। তবু এক বুদবুদ্ উঠেছিল।

অবাধ্য

রুনুর মা সেদিন রুনুকে ডেকে বললেন, দেখি, এদিকে এস তো রুনু।

রুনুর তখন স্কুলে যাওয়ার সময়। দুপাশের দুটি বিনুনি ঝাঁকিয়ে, ফ্রকের বেল্টটা বাঁধতে বাঁধতে বলল, তাড়াতাড়ি বল মা, সময় হয়ে গেছে।

কিন্তু মা কিছুই বললেন না, শুধু একটু তাকিয়ে দেখে বললেন, আচ্ছা, ঘুরে এস স্কুল থেকে।

রুনুর মুখখানা লাল হয়ে উঠল। চোখের পাতা গেল নেমে। কোন রকমে যেন পালিয়ে গেল মায়ের কাছ থেকে। লজ্জা, বিস্ময় আর বিচিত্র একটু বিক্ষোভে মনে মনে বলল, মা যেন কী! এমন করে তাকান যেন কী একটা অন্যায় বুঝি করে ফেলেছে রুনু! গায়ের মধ্যে এমন করে ওঠে।

কেন কী করেছে রুনু? মা আজকাল প্রায়ই এ রকম করেন। এখানে যেয়ো না, ওখানে যেয়ো না, হেসো না অত জোরে। ও-রকম দাপাদাপি কোর না রুনু। কেন? না, মা কেবল বলবেন : কেন আবার। বড় হচ্ছ না এখন? কোথাও বেড়াতে গেলে বলবেন, রুনু, তুমি বেশী দূরে যেয়ো না। কাছাকাছি থেক। কেন? না, বড় হচ্ছ না তুমি?

বড় হচ্ছে, না, ছাই হচ্ছে রুনু। বড় বিরক্তি লাগে।

পর-মুহূর্তেই রুনুর মনটা আবার অন্তঃস্রোতে বহে উজানে। লজ্জা করে বলতে, ভীষণ লজ্জা করে, আর আশ্চর্য আনন্দ বোধ হয়, কোথায় যেন কেমন করে সে সত্যি বড় হয়ে যাচ্ছে। মা যেন ভগবান! ভগবানের মত সব দেখতে পান!

প্রায় পৌনে এক মাইল হাঁটতে হয় রুনুকে স্কুলে যাওয়ার জন্যে। মফঃস্বলের এ ছোট সহরে তাদের মোটর-বাস নেই স্কুলে যাবার। অনেক মেয়েই হেঁটে যায়। রুনুও যায়। স্কুলে পাঠিয়েও নাকি মায়ের বড় ভাবনা।

স্কুলের মাঠ পেরিয়ে, লাফাতে লাফাতে দোতলার সিঁড়ি ভেঙে ক্লাস এইটের ঘরে ঢুকতে না ঢুকতে সব ভুলে গেল রুনু। তখনও ক্লাস বসে নি। মনিটর দীপালি কাজল-ধ্যাবড়ানো ছোট ছোট চোখে এক-একজনের দিকে তাকাচ্ছে আর নাম টুকছে। নামের পাশে পাশে লিখে রাখছে,

'চেঁচিয়ে হাসি', 'অলকার চুল ধরে টানা', 'দিদিমণির টেবিলের ওপর বসা', 'বাদামভাজার খোসা ছড়ানো' ইত্যাদি।

রুনুর সে দিকে খেয়াল নেই। তিপুর সঙ্গে চোখাচোখি হতেই দুর্জ্জয় অভিমান ঝিলিক দিল তার চোখে। ঠোঁট দুটিও ফুলে উঠল একটু।

তিপু অর্থাৎ তৃপ্তি ছুটে এসে রুনুর থুতনি তুলে ধরে বলল, রাগ করেছিস ভাই রুনু ?

না।

না আবার! রাগ না করলে বুঝি রুনু এমন করে!

তিপু বলল, আজ তোর জন্যে দাঁড়াতুম ঠিক। কিন্তু বাবার সঙ্গে এলুম রিকশায় চেপে, সত্যি। তা নইলে বুঝি দাঁড়াই নে ?

রুনু চোখ তুলে তাকায়। মুখের অন্ধকার প্রায় কেটে আসে। সত্যি, বাবার সঙ্গে এলে তো কিছু বলার নেই।

তিপু আবার বলল, আর বাবাকে দাঁড়াতে বললে, বাবা যদি রাগ করত ?

তাও তো বটে। বাবারা যে সব সময় কাজ করেন। রুনুর ঠোঁটে হাসি ফুটে উঠল। বলল, একলা একলা আসতে এত খারাপ লাগে—

বলতে বলতেই রুনুর চোখে পড়ে যায় তিপুর বিনুনির ভাঁজে পুরানো ফিতের ফুঁপড়ি বেরিয়ে পড়েছে। বিনুনি ধরে টেনে বলল রুনু, এদিকে আয়, খারাপ দেখাচ্ছে।

বলে সুকৌশলে ফিতের ফুপড়ি ঢুকিয়ে দিল বিনুনির ভাঁজে। তার পর চোখাচোখি হতে হাসল দুজনে।

এ স্কুলে নতুন এসেছে রুনু। এ বছরেই এসেছে। আগের স্কুলটা নাকি বাজে, বাবা বলেছেন। আর এ স্কুলে ভর্তি হয়ে অনেক মেয়ের সঙ্গে মিশতে মিশতে সবচেয়ে তার ভাব বেশী জমে গেছে তিপুর সঙ্গে।

প্রথম প্রথম তিপু দূর থেকে তাকিয়ে থাকত। তখনও ওদের আলাপ হয় নি। প্রথম যেদিন চোখে চোখ পড়ে গেল রুনুর, সেদিন ওর কী অস্বস্তি। আর লজ্জাও করছিল ভীষণ। প্রায় সব পিরিয়ডের দিদিমণিদের কাছেই ওকে বকুনি খেতে হয়েছে অন্যমনস্কতার জন্যে।

কিন্তু কী করবে রুনু! কেবলই মনে হচ্ছিল, তিপু ওর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। কেন ? কে মেয়েটা, বারে বারে অমন করে তাকাচ্ছে! আর তো কেউ অমন করে তাকায় না। চোখে যেন পলক পড়ে না মেয়েটার। কী যেন রয়েছে তার চোখে, তার অপলক সুন্দর চোখ দেখে

রুনুর লজ্জা করছিল, অস্বস্তি হচ্ছিল, তার মধ্যে কোথায় একটু ভাল-লাগার ভাবটুকুও এসে গিয়েছিল। শুধু অচেনা হলে মানুষ ও-রকম করে তাকায় না। যেন কী হয়ে গেছে মেয়েটার রুনুকে দেখে। ঠোঁটের কোণে একটু হাসির আভাসও বুঝি উঠছিল চমকে চমকে!

সে-ই যে চোখ নামিয়েছিল রুনু, আর কিছুতেই তাকাতে পারে নি। কিন্তু তাকাবার জন্যে মনটা হাঁসফাঁস করছিল ভিতরে ভিতরে। আড়চোখে তাকাতে গিয়েও লক্ষ্য করেছে, ঠিক তাকিয়ে আছে সে।

পরদিনই আবার চোখাচোখি হয়ে গেল রাস্তায়। একই রাস্তা দিয়ে হেঁটে আসছিল দুটিতে। মা গো! ধক্ করে উঠেছিল রুনুর বুকের মধ্যে। পর-মুহূর্তেই লজ্জায় চোখের পাতা আনত হল রুনুর। লাল ছোপ ধরে গেল মুখে।

কত মেয়ের সঙ্গে কত সহজে আলাপ হয়ে যায়। পাঁচ-দশ মিনিটের মধ্যে আলাপ হয়ে কত কথাই না হয়ে যায়। আর এখানে কথা বলা দূরে থাকুক, সহজভাবে তাকাতেই পারে নি রুনু। মেয়েটাও কথা বলতে পারছিল না যেন কিছুতেই।

ক্লাসে গিয়েও সেই একই অবস্থা।

তিন দিন চলেছিল প্রায় একই রকম। কিন্তু রুনুর প্রাণ ভিতরে ভিতরে ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল মেয়েটির জন্যে। তিপুর নামটা শুনে নিয়েছিল ইতিমধ্যে। কিন্তু আড়চোখে কত আর তাকাবে রুনু তিপুর দিকে! কেন যে ভাব হয় না মেয়েটার সঙ্গে!

চার দিনের দিন, টিফিনে ক্লাসে কেউ ছিল না তখন। রুনু কোনদিনই বাড়ি যায় না টিফিনে। মাঠে মেয়েরা খেলা করছিল। রুনু মাঠে না গিয়ে, ক্লাসের জানালায় গিয়ে দাঁড়াল। তিপু খেলা করবে, রুনু দেখবে লুকিয়ে লুকিয়ে।

সবে দাঁড়িয়েছে জানালায়, পিঠে আঙুলের খোঁচা খেয়ে ফিরতেই, তিপু! কিন্তু লজ্জা পাবার সময় না দিয়েই বলে উঠল তোমার সঙ্গে ভাব করতে এলুম ভাই। উঃ কি মেয়ে ভাই তুমি। বড্ড গম্ভীর।

রুনুর লজ্জা-লজ্জা করছিল। তবু হেসে বলল, যাঃ।

তিপু বলল, ইস। নয়? তোমাকে দেখে আমার এত ভাল লাগছিল! যতবারই তোমার দিকে তাকাই, তুমি কেমন গম্ভীর হয়ে মুখ ফিরিয়ে নিতে। তোমার ভাই একটু অহঙ্কার আছে।

রুনু হেসে বলল, হ্যাঁ, তাই বুঝি! কিন্তু তুমি কিচ্ছু জান না, আমার কী ভীষণ লজ্জা করছিল, সত্যি।

'চেঁচিয়ে হাসি', 'অলকার চুল ধরে টানা', 'দিদিমণির টেবিলের ওপর বসা', 'বাদামভাজার খোসা ছড়ানো' ইত্যাদি।

রুনুর সে দিকে খেয়াল নেই। তিপুর সঙ্গে চোখাচোখি হতেই দুর্জ্জয় অভিমান ঝিলিক দিল তার চোখে। ঠোঁট দুটিও ফুলে উঠল একটু।

তিপু অর্থাৎ তৃপ্তি ছুটে এসে রুনুর থুতনি তুলে ধরে বলল, রাগ করেছিস ভাই রুনু ?

না।

না আবার! রাগ না করলে বুঝি রুনু এমন করে!

তিপু বলল, আজ তোর জন্যে দাঁড়াতুম ঠিক। কিন্তু বাবার সঙ্গে এলুম রিকশায় চেপে, সত্যি। তা নইলে বুঝি দাঁড়াই নে ?

রুনু চোখ তুলে তাকায়। মুখের অন্ধকার প্রায় কেটে আসে। সত্যি, বাবার সঙ্গে এলে তো কিছু বলার নেই।

তিপু আবার বলল, আর বাবাকে দাঁড়াতে বললে, বাবা যদি রাগ করত ?

তাও তো বটে। বাবারা যে সব সময় কাজ করেন। রুনুর ঠোঁটে হাসি ফুটে উটল। বলল, একলা একলা আসতে এত খারাপ লাগে—

বলতে বলতেই রুনুর চোখে পড়ে যায় তিপুর বিনুনির ভাঁজে পুরানো ফিতের ফুঁপড়ি বেরিয়ে পড়েছে। বিনুনি ধরে টেনে বলল রুনু, এদিকে আয়, খারাপ দেখাচ্ছে।

বলে সুকৌশলে ফিতের ফুপড়ি ঢুকিয়ে দিল বিনুনির ভাঁজে। তার পর চোখাচোখি হতে হাসল দুজনে।

এ স্কুলে নতুন এসেছে রুনু। এ বছরেই এসেছে। আগের স্কুলটা নাকি বাজে, বাবা বলেছেন। আর এ স্কুলে ভর্তি হয়ে অনেক মেয়ের সঙ্গে মিশতে মিশতে সবচেয়ে তার ভাব বেশী জমে গেছে তিপুর সঙ্গে।

প্রথম প্রথম তিপু দূর থেকে তাকিয়ে থাকত। তখনও ওদের আলাপ হয় নি। প্রথম যেদিন চোখে চোখ পড়ে গেল রুনুর, সেদিন ওর কী অস্বস্তি। আর লজ্জাও করছিল ভীষণ। প্রায় সব পিরিয়ডের দিদিমণিদের কাছেই ওকে বকুনি খেতে হয়েছে অন্যমনস্কতার জন্যে।

কিন্তু কী করবে রুনু! কেবলই মনে হচ্ছিল, তিপু ওর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। কেন ? কে মেয়েটা, বারে বারে অমন করে তাকাচ্ছে! আর তো কেউ অমন করে তাকায় না। চোখে যেন পলক পড়ে না মেয়েটার। কী যেন রয়েছে তার চোখে, তার অপলক সুন্দর চোখ দেখে

রুনুর লজ্জা করছিল, অস্বস্তি হচ্ছিল, তার মধ্যে কোথায় একটু ভাল-লাগার ভাবটুকুও এসে গিয়েছিল। শুধু অচেনা হলে মানুষ ও-রকম করে তাকায় না। যেন কী হয়ে গেছে মেয়েটার রুনুকে দেখে। ঠোঁটের কোণে একটু হাসির আভাসও বুঝি উঠছিল চমকে চমকে!

সে-ই যে চোখ নামিয়েছিল রুনু, আর কিছুতেই তাকাতে পারে নি। কিন্তু তাকাবার জন্যে মনটা হাঁসফাঁস করছিল ভিতরে ভিতরে। আড়চোখে তাকাতে গিয়েও লক্ষ্য করেছে, ঠিক তাকিয়ে আছে সে।

পরদিনই আবার চোখাচোখি হয়ে গেল রাস্তায়। একই রাস্তা দিয়ে হেঁটে আসছিল দুটিতে। মা গো! ধক্ করে উঠেছিল রুনুর বুকের মধ্যে। পর-মুহূর্তেই লজ্জায় চোখের পাতা আনত হল রুনুর। লাল ছোপ ধরে গেল মুখে।

কত মেয়ের সঙ্গে কত সহজে আলাপ হয়ে যায়। পাঁচ-দশ মিনিটের মধ্যে আলাপ হয়ে কত কথাই না হয়ে যায়। আর এখানে কথা বলা দূরে থাকুক, সহজভাবে তাকাতেই পারে নি রুনু। মেয়েটাও কথা বলতে পারছিল না যেন কিছুতেই।

ক্লাসে গিয়েও সেই একই অবস্থা।

তিন দিন চলেছিল প্রায় একই রকম। কিন্তু রুনুর প্রাণ ভিতরে ভিতরে ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল মেয়েটির জন্যে। তিপুর নামটা শুনে নিয়েছিল ইতিমধ্যে। কিন্তু আড়চোখে কত আর তাকাবে রুনু তিপুর দিকে! কেন যে ভাব হয় না মেয়েটার সঙ্গে!

চার দিনের দিন, টিফিনে ক্লাসে কেউ ছিল না তখন। রুনু কোনদিনই বাড়ি যায় না টিফিনে। মাঠে মেয়েরা খেলা করছিল। রুনু মাঠে না গিয়ে, ক্লাসের জানালায় গিয়ে দাঁড়াল। তিপু খেলা করবে, রুনু দেখবে লুকিয়ে লুকিয়ে।

সবে দাঁড়িয়েছে জানালায়, পিঠে আঙুলের খোঁচা খেয়ে ফিরতেই, তিপু! কিন্তু লজ্জা পাবার সময় না দিয়েই বলে উঠল তোমার সঙ্গে ভাব করতে এলুম ভাই। উঃ কি মেয়ে ভাই তুমি। বড্ড গম্ভীর।

রুনুর লজ্জা-লজ্জা করছিল। তবু হেসে বলল, যাঃ।

তিপু বলল, ইস। নয়? তোমাকে দেখে আমার এত ভাল লাগছিল! যতবারই তোমার দিকে তাকাই, তুমি কেমন গম্ভীর হয়ে মুখ ফিরিয়ে নিতে। তোমার ভাই একটু অহঙ্কার আছে।

রুনু হেসে বলল, হ্যাঁ, তাই বুঝি! কিন্তু তুমি কিচ্ছু জান না, আমার কী ভীষণ লজ্জা করছিল, সত্যি।

সত্যি ?

হ্যাঁ।

আমারও। জান,এত লজ্জা করছিল, কিছুতেই ভাব করতে পারছিলুম না।

তবে আমি এসে ভাব না করলে তুমি কিছুতেই কথা বলতে না, না ?

রুন্নু বলল, মোটেই তা নয়। আমি ঠিক আজকে তোমার সঙ্গে ভাব করে ফেলতুম। আমার ভীষণ ইচ্ছে করছিল।

তার পরে সত্যি সত্যি ভাব হয়ে গেল। এত ভাব আর কারুর সঙ্গে হয় নি রুন্নুর।

মা যে আজকাল রুন্নুকে পায়ে পায়ে সাবধান করেন, বড় হচ্ছ বড় হচ্ছ বলেন, সেটুকুও তিপুকে না বললে তার চলে না।

এমন কি সেদিন যে অমন হঠাৎ ডেকে এক মুহূর্ত তাকিয়ে বলেছিলেন, আচ্ছা, স্কুল থেকে ঘুরে এস। তারপর বিকেলে দরজি ডাকিয়ে নতুন জামার মাপ নিয়ে, তৈরি করিয়ে দিয়েছিলেন অন্য রকম ঝাঁপালো-ফাঁপালো লুজ ফ্রক, সেটুকুও বলে। সব বলে—সবটুকু, তার এই চোদ্দ বছর গহীনের সব কথা—সব অজানা সংশয়, তার রক্তের বিচিত্র বিস্ময়।

তিপুও বলে। কিন্তু তিপু ওর মায়ের কথা তেমন করে বলে না। বাবা নাকি ওর নেই। না-ই বা থাকলেন, তা বলে রুন্নুকে কী একদিন তিপু ওদের বাড়িতে যেতে বলতে পারে না! নিজেও যেতে বলবে না, আর রুন্নু এতবার তিপুকে তাদের বাড়ি নিয়ে যেতে চায়, তিপু যায় না। খালি বলে, আচ্ছা, আর একদিন যাব, সত্যি, মাইরি! কেন ? এমন করে এড়িয়ে কেন যায় তিপু ? কষ্ট হয় না বুঝি, রাগ হয় না, না ?

একদিন শনিবারের ছুটির পরে দুজনে ওরা হেঁটে আসছিল। বড় রাস্তার কাছেই একটি রাস্তার বাঁকে রুন্নুদের বাড়ি। তিপুদের বাড়ি আরও ছাড়িয়ে—সেই বাজার পার হয়ে গঙ্গাধারের কাছাকাছি।

এই দিনে রুন্নু বলল রাস্তায় চলতে চলতে, তিপু, আজ আমাদের বাড়ি তোকে যেতেই হবে।

তিপু বলল প্রতিদিনের মত, আজ না ভাই রুন্নু, আর একদিন যাব।

আজ রুন্নুর মুখ ভার হয়ে উঠল। হাতে ধরে টানল তিপুর। হাসতে হাসতে হাত-টানাটানি করল দুজনেই। তারপর রুন্নুর চোখে যেন মেঘ করে এল। হঠাৎ হাত ছেড়ে দিয়ে বলল, থাক্ তা হলে, আসিস নে।

রাগ করলি ভাই ?

না।

তিপু হেসে রুনুর হাত ধরে বলল, আহা, মেয়ে যেন একেবারে মনসা। চল্ চল্, যাচ্ছি। তোর মা রাগ করবেন না তো?

ভাগ। সবাই কত যায়। বীণা, কুসুম—

তারপরেই দুটি বড় বড় ছেলের দিকে চোখ পড়তেই রুনু বলে উঠল, দেখছিস, লোক দুটো কী রকম করে তাকাচ্ছে!

তিপু বলল, তাকাকগে মুখপোড়াগুলো!

তিপুর এমন পাকা গালাগাল শুনে দুজনেই চাপা গলায় খিলখিল করে হেসে উঠল। পর মুহূর্তেই বোধ হয় রুনুর মনে পড়ে যায়, এ রকম হাসা উচিত নয়। মা দেখলে খুব রাগ করতেন।

বাড়ি গিয়ে, তিপুকে নিয়ে একেবারে মার ঘরে চলে এল রুনু: দেখ মা, কাকে নিয়ে এসেছি আজ।

মা তখন খাটে শুয়ে উপন্যাস পড়ছিলেন। ভেজা চুল ছড়ানো, পান খেয়েছেন ঠোঁট লাল করে। মায়ের এই রূপটি তিপুকে দেখাতে পেরেও রুনু খুব খুশি মনে মনে। এ সময় মাকে তার এত সুন্দর লাগে, ঠিক যেন একটি মহারাণী। সুন্দর লাগে, আবার ভয়-ভয়ও করে।

মা বই থেকে চোখ তুলে বললেন, কে?

রুনু বলল, তিপু গো, সেই যার কথা তোমাকে অনেকবার বলেছি।

কিন্তু মা তো কই হেসে, ভালবেসে ডেকে উঠলেন না এখনও তিপুকে! বরং মায়ের ভ্রূ দুটি কেমন যেন মেঘভার আকাশের বিদ্যুতের মত ঢেউ খেলে গেল। রাগ করেন নি, তবু যেন কেমন একটু উদাসীন ভাব। বললেন, ও, তোমার নাম তিপু?

তিপু সলজ্জ হেসে বলল, হ্যাঁ।

মা বললেন, বোস, তোমাদের বাড়ি কোথায়? গঙ্গার ধারে? অধর পণ্ডিত লেনের কাছে?

তিপু বসে বলল, হ্যাঁ। আপনি চেনেন?

মা বললেন চিনি বইকি।

তার পরে আরও দু-চারটি কথা বলে মা যেন কেমন সহজেই গা এলিয়ে দিলেন। অন্যমনস্কভাবে ডুব দিলেন বইয়ের পাতায়।

মার বুঝি ঘুম পেয়েছে? না কি বইটা পেয়ে বসেছে মাকে, এক-একটা বই নিয়ে মা অনেক সময় নাওয়া-খাওয়া ভুলে যান। কিন্তু সেদিন ময়নার

সঙ্গে মা কতক্ষণ কথা বললেন। এমন কী ময়নার মা কি কি রান্না করেছেন, সেটুকুও জেনেছেন। আর আজ তিপুকে দেখে মার কেমন যেন গা-এলানো ভাব। তিপু হয়তো মাকে একটা বিচ্ছিরি কুঁড়ে গেঁয়ো মেয়েছেলে ভেবে গেল। মনে মনে বড় রাগ হল রুনুর মায়ের উপর।

কিন্তু তিপু কিছুই বলল না। সহজভাবেই হেসে, ঘুরে সারা বাড়িটা প্রায় দেখল রুনুদের। ছাদে দাঁড়িয়ে বড় রাস্তাটা দেখা যায়। বেলা বুঝি তখন দু'টা বেজেছে। ভাদ্রের মেঘলা-ভাঙা রোদ প্রায় ফাঁকা রাস্তাটার উপর ভ্রূ কুঁচকে আছে। বড় জলুনি এই রোদে। শুধু একটি লোক হেঁটে যাচ্ছে খোঁড়াতে খোঁড়াতে, ছেঁড়া নেংটি পরে, খালি গায়ে। নিশ্চয় ভিখিরী।

দুই বান্ধবী খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইল লোকটির দিকে। তারপর যখন দুজনের চোখাচোখি হল, তখন তাদের দুজনের মনই এক বিস্ময়কর বেদনায় ভরে গিয়েছে। এই প্রথম শরতে অনেকখানি-ছড়িয়ে-পড়া আকাশের তলায় হঠাৎ কেমন উদাস হয়ে যায় দুজনেই। রুনু বলল ফিসফিস করে, ভারি কষ্ট হয় দেখলে, না?

তিপু বলল, হ্যাঁ! জানিস, আমি যখন রাত্রে শুয়ে চোখ বুজব, তখন ঠিক লোকটা অমনি করে হেঁটে যাবে আমার চোখের ওপর দিয়ে। কেন এ রকম হয় ভাই?

রুনুও বলল অসহায়ভাবেঃ কি জানি। আমি স্বপ্ন দেখে ঠিক জেগে উঠব অনেক রাত্রে।

কেন যে এই অজানা ব্যথায় ভরে ওঠে মন, এই দুই সখী তা বোঝে না। শুধু কারুর কষ্ট দেখলেই, তাদের বুক ছাপাছাপি হয়ে যায়। একটুখানি আনন্দের সন্ধান পেলে হেসে হেসে মরে যায় তারা।

তারপরে তিপু বলল, এবার যাই।

রুনু বলল, আর একটু থাক্ ভাই। আয়, চল্ দুজনেই ভাত খেয়ে নি, অ্যাঁ?

তিপু বলল, ভাগ, না ভাই, আজ নয়, আর একদিন হবে।

তিপু চলে গেল। তার পরে মার উপরে অভিমানটা আবার ফিরে এল রুনুর মনে। মার কাছে আর গেল না। রান্নাঘরে গেল খেতে। সেখানে তার ভাত ঢাকা দেওয়া আছে।

কিন্তু তার আগেই রুনুর পায়ের শব্দ পেয়ে মা ডাকলেন।

রুনু মুখখানি ভার-ভার করে গেল মায়ের কাছে। কিন্তু মা ওসব চেয়েও দেখলেন না। তিনি ততক্ষণে উঠে বসেছেন। জিজ্ঞেস করলেন, চলে গেছে তোমার বন্ধু ?

হ্যাঁ।

শোন।

কেন ?—মার গলা যেন কেমন শাণিত হয়ে উঠছে। চাউনিটি যেন রাগ-রাগ ভাবের।

রুনু অভিমানে ডুবে গেল। বলল, কী বলছ মা ?

মা বললেন, ও-ই যে তোমার তিপু, তা জানতুন না। ওকে আর কোনদিন বাড়িতে এনো না, ওর সঙ্গে মেশামিশিও কোর না একদম।

রুনুর দুটি বড় বড় চোখ বিস্ময়ে ও অজানা ভয়ে পলকহারা হয়ে গেল। জিজ্ঞেস করল, কেন মা ?

মার ভ্রূ দুটি কুঁচকে উঠল। কী ভয় করছে এখন মাকে দেখে! মা অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, সব কথা তোমাকে বলতে পারব না, জেনে রাখ, ওরা ভাল নয়। ওদের সঙ্গে কোন ভদ্রলোকের ছেলেমেয়ের মেলামেশা একদম উচিত নয়।

কী একটা বিশেষ ভয়াল ইঙ্গিত আছে যেন মার কথায়! তাই মা অমন এলাকাড়ি দিয়েছিলেন তিপুকে দেখে। কিন্তু তিপু! তিপুর তো কোনদিন কিছু খারাপ দেখে নি রুনু। ক্লাসের মায়া নাকি কাকে কী সব চিঠিপত্র লেখে! শোভা কত রকমের বাজে কথা বলে। তিপু তো সে রকম কথা কোনদিন বলে নি!

রুনু বলল খুব ভয়ে ভয়ে, জান মা, তিপু কিন্তু ক্লাসের পড়া খুব ভাল দেয়। ইংরিজীতে—

শোন রুনু।—মার গলা রুনুর বুকে যেন কেটে কেটে বসে। বললেন, তিপু লেখাপড়ায় কত ভালমন্দ, আমি ওসব শুনতে চাই নে। তিপুর কী দোষ আছে, গুণ আছে তাও আমি জানি নে। কিন্তু তিপুর সঙ্গে তোমার মেশা দূরের কথা, কথা বলাও উচিত নয়। কী করে ও-মেয়েকে স্কুলের দিদিমণিরা পড়তে দিচ্ছে বুঝি নে। খালি জেনে রাখ, ওর মা ভীষণ খারাপ, ভীষণ! যার চেয়ে আর কিছু হয় না, বুঝেছ ?—বলে রুনুর চোখের দিকে তাকালেন মা। কী একটা বিশ্রী ইঙ্গিত ছিল মায়ের কথায়, রুনুর মুখ লাল হয়ে উঠল। আর তিপুর মার কথা ভাবতে গিয়ে শহরের এক

শ্রেণীর মেয়ের চেহারা ভেসে উঠল তার চোখের সামনে। মার কথা থেকে সেই সব মেয়ের মূর্তিই ভেসে ওঠে।

কিন্তু তিপুর সঙ্গে তো কোন মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। তিপুকে রুনু তার চেয়ে সব বিষয়ে অনেক সুন্দর দেখে।

বোধ হয় রুনুর মুখে কিছু সংশয়ের ছায়া দেখে দৃঢ় গলায় মা বললেন, মোট কথা, তুমি এখন বড় হচ্ছ। তিপুর সঙ্গে একেবারে মিশবে না, কথাও বলবে না। যাও খেয়ে নাও গে। এখুনি তোমার গানের মাষ্টার মশাই এসে পড়বেন আবার।

চলে গেল রুনু। কিন্তু তিপুর কোন দোষের কথা তো মা বললেন না। তিপুর তো কোন দোষ নেই। কথা বলবে না সে তিপুর সঙ্গে। তবে কী বলবে সে তিপুকে! তিপু যখন হাসবে তার দিকে তাকিয়ে; ডাকবে—এই রুনু, শোন্, তখন কী করবে রুনু, সে কথা কেন মা বলে দেবেন না! এমনি মিছিমিছি একজনের সঙ্গে কখনও আড়ি করা যায়! তিপু যদি সেই আগের মত একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে, তখন কী হবে রুনুর?

খেতে বসে বুকের মধ্যে টনটন করতে লাগল রুনুর। মরে গেলেও তো সে তিপুকে তার মায়ের বিষয় জিজ্ঞাসা করতে পারবে না। গান করতে বসে 'জগরণে যায় বিভাবরী'-র স্বরলিপি তুলতে গিয়েও তার মনে হল, আচ্ছা, কেন এত প্যাঁচালো এই পৃথিবীটা! কার সঙ্গে এখন এ বিষয় নিয়ে রুনু আলোচনা করবে! তার আলোচনা করা দরকার, জানা দরকার, বোঝা দরকার।

রাত্রে সে যে বাইরের উঠোনের অন্ধকারে বসে ছিল, মা বোধ হয় তা জানতেন না। শুনতে পেল, মা বাবাকে বলছেন, তবে আর তোমাকে বলছি কী। দেখি রুনুর সঙ্গে একেবারে আমার ঘরে এসে হাজির। আমি তো একেবারে শিউরে উঠেছি দেখে। এ কী, মঙ্গলার মেয়ে এ বাড়িতে কেন? সে যে আবার স্কুলে পড়ে, তা কে জানত!

বাবার গলা শোনা গেল, দিনকাল তো বদলে যাচ্ছে।

মা বললেন, তা বলে একটা প্রষ্টিটিউটের মেয়েকে স্কুলে রাখবে? অন্যান্য মেয়েরা খারাপ হয়ে যাবে না?

বাবা বললেন, শুনেছিলুম মঙ্গলা ওর মেয়েকে কোন এক আলাদা বাড়িতে রেখে দিয়েছে।

যতই রাখুক আলাদা, তবু সে যা তাই।

প্রষ্টিটিউট শব্দটার আভিধানিক মানে জানে না রুন্নু। ভাবগত অর্থটা জানে। ঠিক যে সব মেয়েদের কথা ভেবেছিল সে, তবে তা-ই তিপুর মা! তিপুর মত মেয়ের মা এই রকম কেন হয়? তিপু তো তার চেয়ে মোটেই খারাপ নয়। ও, তাই বুঝি তিপু কোনদিন রুন্নুকে তাদের বাড়ি যেতে বলত না!

কিন্তু তিপুকে কী বলবে রুন্নু! মা-বাবার কাছে যেটা সমস্যা, রুন্নুর কাছে সেটা কোন সমস্যাই নয়। ওঁদের কাছে তিপু শুধু খারাপ মেয়েমানুষের মেয়ে। রুন্নুর যে বন্ধু।

কিন্তু রুন্নু মনে মনে ঠিক জানে, তার আর কিছুতেই তিপুর সঙ্গে কথা বলা চলবে না, মেলামেশা তো অনেক দূরের কথা।

পরদিন আগে আগে বেরিয়ে গেল রুন্নু স্কুলে। তিপু এসে রোজ দাঁড়িয়ে থাকে রাস্তার মোড়ে একসঙ্গে যাবার জন্য। তার আগেই বেরিয়ে যেতে হবে। কিন্তু কী দুর্ভাগ্য, তিপু যে এত আগে এসে রোজ দাঁড়িয়ে থাকে, কে জানত! তিপু হেসে বলে উঠল, উঃ আজ খুব সকাল সকাল এসেছিস তো! রুন্নু দেখল, আজও ঠিক তিপু বেণী দুটি যা-তা করে বেঁধে এসেছে। ফ্রকের পিঠের বোতামগুলি লাগায় নি ঠিক করে।

রুন্নু গম্ভীর হয়ে গেল। রাগ করে নয়। বুকটা কী রকম ধড়াস ধড়াস করছে! মার কথাগুলো মনে পড়ছে। কী বলবে সে তিপুকে! মার উপরে, সংসারের উপরে ভীষণ রাগ হচ্চে আর কান্না পাচ্ছে রুন্নুর। আর, আর তিপুর উপরেও রাগ হচ্ছে। কেন মরতে ও-রকম মায়ের মেয়ে হয়েছে! হল যদি, তবে রুন্নুকে কেন ভালবেসেছে!

তিপু কিন্তু থতিয়ে গেছে রুন্নুর ভাব দেখে। কেন, এ রকম করছে কেন রুন্নু! রুন্নুর মুখে তো সে ভাবের অভিমান লেগে নেই! তিপুর উপর রাগলে তো তাকে এ রকম দেখায় না! তবে, তবে—? তিপু যেন সাপ। অ্যাসিডের গন্ধ পেয়ে সতর্ক সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। মাথা নত হল তারও। মুখখানি ভরে গেল একটি বোবা ব্যথার অভিব্যক্তিতে। তোর মা রাগ করেছে, না?

রুন্নু পিছন ফিরে তাকাল। কে জানে, মা ছাদে দাঁড়িয়ে আছে কি না! নেই। রুন্নু কোন রকমে ঘাড় নেড়ে, হঠাৎ জোরে জোরে হাঁটতে লাগল তার স্লিপারে শব্দ তুলে। তিপু আস্তে আস্তে হাঁটতে লাগল তার শক্ত হিলে খট খট করে।

এর চেয়ে বেশী কিছু বলার দরকার ছিল না তিপুকে। এইটুকুর মধ্যেই আসল গণ্ডগোলটা জানাজানি হয়ে গেল ওদের।

এতে ওরা কে কতখানি আঘাত পেয়েছে, কে কত কেঁদেছে লুকিয়ে, সেটা জানাজানি হওয়ার কোন উপায় রইল না। মেশামেশি, কথা-বলাবলি বন্ধ হয়ে গেল ওদের আপনা থেকেই। ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল দুজনে।

কিন্তু রুনুর তবু মনে হয়, তিপু ক্লাসে তাকিয়ে আছে তার দিকে। তাই মাঝে মাঝে ও আড় চোখে তাকায়।

আসলে ওরা দুজনেই সোজা চোখে তাকাতে গেছে ভুলে। কিন্তু তাকানোটা এ জীবনে যেন শেষ হবে না আর। আর, বুকের মধ্যে কোথায় যেন আছে একটি মস্ত তেপান্তর। সেখানে যেন পূব-সাগরের ঝড়ো বাতাস মাথা কোটে নিরন্তর।

কে এসে দুজনের মাঝখানে পড়ে রাস্তার ডাইনে বাঁয়ে সরিয়ে দিয়েছে ওদের। কিন্তু বিচ্ছেদের আড়ালে, কাঁদতে গিয়ে হাসবার মত একটি বিচিত্র খেলা পেয়ে বসেছে দুটিকে।

তিপু অপেক্ষা করে না আগে এসে, রুনু ছুটে আসে না কারুর আশায়, তবু ওদের দেখা হয়ে যায় রোজ। কিন্তু মিশতে মানা, কথা বলতে মানা। রাস্তার দু পাশ ধরে দুজনে যায় হেঁটে। যেন একজনকে ঠেলে দেওয়া হয়েছে পথের এক পাশে, আর একজনকে টেনে ধরে রাখা হয়েছে আর এক পাশে।

আড়চোখে দেখে কি না! কে জানে। না দেখাই উচিত, কেন না, ওদের মানা আছে। বেলা দশটার রোদে ওদের ছায়া দুটি শুধু জানে, কী করে ওরা, কী হয় ওদের।

খানিকটা এগিয়ে মিউনিসিপালিটি, তারপরে অনেকগুলো দোকান—ঘোষের খাটাল, কামারের দোকান, একটা কালভার্ট, সিনেমা-হল, ডাক্তারখানা, ফোটোর দোকান। তারপরে ডান দিকে একটি রাস্তা চলে গেছে পূব দিকের মাঠে। ওদিকটার কোন সীমা নেই। বড় বড় গাছের ফাঁকে ফাঁকে মাঠ, ধানক্ষেত, জঙ্গল, দূর গ্রাম। তার পরে আরও যেন কত কী! কত কী! শুধু তার ইশারা নিয়ে পড়ে থাকে আকাশটা।

কিন্তু ওরা যায় সোজা উত্তরে—কারখানা পেরিয়ে, পোস্ট-অফিস্ ডিঙিয়ে, তার পরে স্কুল।

ওদের মানা আছে, ওরা কথা বলে না, মেশে না। যেন দুটি আলাদা

জগৎ, নত মুখে, সামনে তাকিয়ে, নিস্পৃহভাবে চলে যায় রাস্তার দু' পাশ দিয়ে। রোজ রোজই এই খেলা।

তার পরে একদিন এই খেলার আয়ু শেষ হয়ে আসে। পৃথিবীতে সব খেলারই যেমন একদিন শেষ হয়।

পূজোর ছুটি কেটে গেছে। শরৎ গিয়ে হেমন্তের কাল এসে পড়েছে আকাশে। বাতাসে মাঝে মাঝে উত্তরের ঝাপটা টের পাওয়া যায়। আকাশ যেন বছর কাবারের আগে বড় বেশী নীল হয়ে গেছে। আরও বড়, অনেক বড় হয়ে সে হারিয়ে যেতে চাইছে। রোদে নতুন আমেজ। শীত আসার আগেই পাখিগুলি সারাদিন ডেকে নিচ্ছে প্রাণভরে।

আজও তেমনি না তাকিয়েও মোড়ের মাথায় এসে পরস্পরকে টের পেয়ে গেল ওরা। তার পর যেমন চলে, তেমনি চলতে লাগল।

মিউনিসিপাল অফিস গেল, পার হয়ে গেল দোকানগুলো, মোষের খাটাল, কামারের দোকান, কালভার্ট—

কেন, তিপু কি আজ আর যেতে চায় না? ওর ছায়াটা যেন পিছিয়ে পড়ছে মনে হয় রুনুর।

তার পরে সিনেমা হল, ডাক্তারখানা, ফোটোর দোকান—

এ কি, কোথায় যাচ্ছে তিপু? রুনু থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। দেখল, তিপু পূবদিকের পথটায় চলে যাচ্ছে হনহন করে। কেন রাগ হয়েছে?

রুনুর মনে হল, মা যেন বলছেন, তুমি ওদিকে কী দেখছ রুনু? যাও স্কুলে চলে যাও, ঘণ্টা বাজার সময় হল।

রুনুর বুকটা কি রকম করছে! ওকে স্কুলে যেতে হবে, কিন্তু তিপু আজ কেন এমন করে খেলা ভেঙে চলে যাচ্ছে! তিপু কি একটুও বোঝে না, একটুও কি কষ্ট হয় না তার রুনুর জন্যে!

রুনু যেন শুনতে পাচ্ছে মায়ের শাসানো চিৎকার—স্কুলে যাও বলছি…।'

কিন্তু এ কী রুনু, অবাধ্য মেয়ে তুই, তুই কেন মাঠের পথে যাস? —নিজেকেই যেন বলে রুনু, আর নিজেই জবাব দেয়, তিপু কি একটুও বোঝে না, কত কষ্টে রুনু চেপে রাখে নিজেকে। না কি তিপু আজ আর সহ্য করতে পারে নি। আর বুঝি সে এমন খেলা খেলতে পারে না।

কিন্তু এ কী, তিপু এত জোরে যাচ্ছে কেন? রুনু পিছু পিছু আসছে বলে? রুনু ডেকে উঠল, তিপু, তি—পু!

অমনি রুনুর কানে বাজল মায়ের হুঙ্কার: খবরদার, খবরদার বলছি রুনু—

কিন্তু তিপু এত জোরে ছুটছে কেন? মাথাটা এত নুয়ে পড়েছে কেন ওর? কাঁদছে, না? কাঁদছে তিপু, আর রুনুর কান্না তুই দেখবি নে চেয়ে, না? তোরই খালি কষ্ট হয়; রাগ হয়, আর আমার বুকটা কেমন করে, তুই জানিস নে? তিপু—তি-পু—

গাছের আড়ালে পড়ল তিপু, আবার দেখা গেল। মাঠে পড়ল, আবার গাছের আড়ালে। বই বুকে চেপে, বেণী উড়িয়ে রুনু ছুটছে। দমের অভাবে আর ডাকতেও পারে না। ফিসফিস করে ডাকে শুধু, তিপু, তিপু, তিপু,—

তার পরে একটা কুলঝোপের কাছে এসে, বই ফেলে রুনু দু হাতে জড়িয়ে ধরে সখীকে। তিপু মাটিতে মুখ গুঁজে ফুলে ফুলে কাঁদতে থাকে। রুনুও কাঁদতে থাকে তিপুর পিঠে মুখ চেপে।

হেমন্তের উদার আকাশ ভরে বাতাস লুটোপুটি খায়। মাঠে মাঠে পাকাধানের গোছা পড়ে নুয়ে। শব্দ হয় ঝিরিঝিরি, গন্ধ ছড়ায় নতুন ধানের। আর মনে হয়, আকাশ আর মাঠ যেন হাসে ঠোঁটের কোণে লুকিয়ে, তাদের দু চোখভরা স্নেহ ও বেদনা। এই যে মেয়ে দুটি আজ প্রথম স্কুল পালিয়ে এসেছে, সমাজ ও মায়ের বারণ মানে নি, তাতে তাদের একটুও রাগ হল না। বরং যেন খুশী হয়ে ঠাঁই দিল এ ঝোপের নির্জনে।

দুটিতে অনেকক্ষণ ধরে শুধু কাঁদল, তারপর ফোঁপাতে লাগল। তার পরে এক সময়ে ফোলা-ফোলা চোখ নিয়ে, গায়ে গায়ে জড়িয়ে বসে রইল চুপ করে, দূর মাঠ ও আকাশের দিকে চেয়ে। তখনও কান্নার হেঁচকি উঠছে দুজনের। তারপর শুধু থেকে থেকে কেঁপে যেতে লাগল ওদের বুকের গভীর থেকে উঠে আসা দীর্ঘশ্বাস।

দুঃখ দেখলে ওদের বুক ছাপাছাপি হয়ে যায়, আনন্দে হেসে বাঁচে না। ভালবাসার টান ধরলে যে সব অনুশাসনের বেড়া ভেঙে ফেলতে পারে, সেটা ওরা জানে না। না জেনে, বাঁধ ভেঙে ওরা জীবনের অচেনা আঙিনায় এসে বোবা হয়ে রইল অনেকক্ষণ।

তিপু দুজনের বইগুলি গোছাল। রুনু তিপুর বিনুনি দুটি বাঁধল ভাল করে, ফ্রকের বোতামগুলি ঠিক করে লাগিয়ে দিল। আর রুনুর বুকের কাছে একটি পাকা ঘামাচি নখ দিয়ে মেরে দিল তিপু। আবার দুটিতে বসে রইল, গায়ে গায়ে, হাতে হাত দিয়ে! কোথায় যেন মেঠো মানুষের

গলা শোনা গেল। গরু ডেকে উঠল দূর থেকে। ফুলগাছে ডেকে গেল পাখি। কখন সূর্য চলে গেল মাথার উপর দিয়ে।

রুনু গুন গুন করে গান গেয়ে উঠল। এতদিন মাস্টারমশায়ের কাছে শিখেছে, বাড়িতে কেউ এলে মা গান করতে বলেছেন। আজ আপনা থেকে গাইছে রুনু—

এমনি করেই যায় যদি দিন যাক না।
মন উড়েছে, উড়ুক না রে মেলে দিয়ে গানের পাখনা।

রুনুর গান শেষ হল। তারপর তিপুও গুন্ গুন্ করে উঠল—

তোমার বাঁশী শুনলে ঘরে রইতে পারি না।
তোমার দেখা পেলে আগল বাঁধতে পারি না॥

দুজনের গান দুরকম। সুরের কোন মিল নেই, ভাবে ও ভাষার কোন মৈত্রী নেই। না-ই বা থাকুক। তারা যা জানে, তা-ই গাইতে লাগল। তাদের সব গান তারা গাইবে আজ পরস্পরের মুখের দিকে তাকিয়ে।

রুনু। মরি মরি, জাগরণে যায় বিভাবরী
আঁখী হতে ঘুম নিল হরি।

তিপু। সখী এ পথ দিয়ে অনেক গেছি,
তাকিয়েছি মিছামিছি
তোমার দেখা পাই নি গো।

রুনু। কবে তুমি আসবে বলে
আমি রইব না বসে,
আমি চলব বাহিরে।

তিপু। অমন কুঞ্জের ধারে আসব না
ভুজঙ্গ সেথা আছে গো,
তবু অঞ্জন মাখি নয়নে
মনোরঞ্জন পাশে আসি গো।

রুনু। আলোকের এই ঝরণা ধারায় ধুইয়ে দাও
আপনাকে এই লুকিয়ে রাখা,
ধূলায় ঢাকা, ধুইয়ে দাও।

তিপু। শিকল দিয়ে বাঁধো নাই তো
কী দিয়ে যে বেঁধেছ—

বাঁধনে যে এত সুখ
ছাড়া যেন না পাই গো।

এই যেন জীবনে দুজনের প্রথম গান গাওয়া। হাসল তারা দুজনে, গম্ভীর বিষণ্ন সে-হাসি। এই বয়সের এত কথা, এত কাকলি—সব ছাপিয়ে, যেন ভরা গাঙের টাবুটুবুতে এসে পড়েছে তারা। অবাধ্য হয়ে তারা বাধ্য হল পরস্পরের। জীবনের কোথায় একটা দরজা খুলে গেল নিঃসাড়ে, দেখে শুধু হাসল ওই আকাশ আর পাকাধানের মাঠ।

রুনু বলল, স্কুলে ছুটির ঘণ্টা বোধহয় পড়ল।

তিপু বলল, চল্ এবার যাই।

মাথার ওপরে আকাশটি চলল সঙ্গে সঙ্গে, মাঠের বাতাস এল পিছু পিছু।

বাড়ি আসতে মা রুনুর দিকে তাকিয়ে একটু অবাক হলেন। বললেন, কী রে, শরীর খারাপ হয়েছে নাকি?

রুনুর বুকের মধ্যে কেঁপে উঠল। বলল, না তো।

তারপরে খেয়েদেয়ে, চুল বাঁধার আগেই আজ রুনুর বড় ঘুম পেতে লাগল। কখন এক সময় ঘুমিয়েও পড়ল মায়ের বিছানায়।

বিকালে ঘরে ঢুকে রুনুকে এমন ঘুমুতে দেখে চমকে উঠলেন মা। গায়ে হাত দিলেন আস্তে আস্তে। না, জ্বর আসে নি। তারপর খানিকক্ষণ রুনুর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে মায়ের কী যেন হল! তিনি হঠাৎ উপর দিকে মুখ করে চুপিচুপি বললেন, মেয়েটা যেন আমার সুখী হয় জীবনে।

ঘরে ঢুকলেন রুনুর বাবা। বললেন, কী করছ?

মা বললেন, কিছু না। জান গো, আমার বড় সাধ, রুনু একখানি শাড়ি পরবে।

শেষ হাসি

অল্প দু' চারখানি নৌকোর যাতায়াত শুরু হয়েছে সবে। কালীনগর-গঞ্জের এটা মরসুম নয়। নতুন ধান ওঠেনি এখনো। আসল কারবার ধানের, তারপরে গরু ভেড়া ছাগল। এই বর্ষার সময়ে সেটাও কম। ভেড়ি বাঁধের গায়ে সারি সারি, রাশি রাশি নৌকো যেন চিত হয়ে পড়ে ঝিমোয় এ সময়ে। হাসনাবাদ থেকে গোসাবা যাতায়াতের পথে যখন কোম্পানীর লঞ্চ ঢেউ তুলে দিয়ে যায়, তখন বেকার নৌকোগুলি যেন বড় বিরক্ত হয়ে খানিক দোলে। তারপর জল শান্ত হয়ে যায়, নৌকোগুলি ঝিমোয় আবার। গঞ্জের মানুষ-গুলিও। কারবার তেজী না থাকলে তাদের দেহ-মনেও মন্দা লাগে। তবুও আজ হাটের দিন। আনাজ তরিতরকারি উঠবে কিছু। আশেপাশে মানুষেরা নিজেরা বেচা-কেনা করবে।

গঞ্জ থেকে খানিকটা নিরালা দক্ষিণে, নদীতে বিনজাল পাতে ঈশান। কালীনগরের উত্তরে, পশ্চিমপাড়ে আখড়াতলায় মানুষ সে। কিন্তু চিরকালই এগিয়ে এসে জাল পাতে, মাছ ধরে।

ভাদ্র মাসের মাঝামাঝি। বর্ষার একটু ধরন হয়েছে কয়েকদিন। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠের পোড়া আকাশ এখন চকচকে নীল। অনেক বৃষ্টি গেছে, গোটা আকাশখানি জলে ধুয়ে ফিরে পেয়েছে আসল রং। সূর্যের আলো পড়লে চোখ রাখা যায় না নীলের এত ঝকমকানি। আকাশের এদিকে ওদিকে আছে শাদা মেঘের টুকরো। এ মেঘ ভিন্‌দেশী—আসে দূর থেকে, যায় দূরে উধাও হয়ে। যেখান দিয়ে যায়, সেখানকার মনগুলিও যেন কেড়ে নিয়ে যায়। কোথায় যেন ডাক দিয়ে যায়।

বাতাসের গতিক বোঝা যায় না। কখন বাঁধের দু পাড় ধরে গেমোগাছের বনে বাতাস শনশনিয়ে যায়। কখনো যায় থমকে। কে যেন তাকে ধরে রাখে অদূর সমুদ্রের কোলে।

আশেপাশে গ্রামের চিহ্ন কম। অধিকাংশই আবাদ অঞ্চল। যতদূর চোখ যায়, শুধু সবুজের বিস্তার। আর ভেড়িবাঁধের সুদূর প্রহরা। নোনা জলে বুক চেপে আছে দাঁড়িয়ে।

নদীর নাম বেতনি। ইছামতীরই ফালি ফ্যাকড়া। এখানকার লোকেরা বলে পেতনি, পেতনি নদী। রূপে সে ভয়ঙ্করী নয়, কিন্তু অশরীরী মায়াবিনী নানান বেশে ফিরছে তার ক্ষুধার্ত অদৃশ্য হাত বাড়িয়ে। রাজত্বটি যেন তার। তার রীতিবিরুদ্ধ অনাচার যে করে, তাকে সে মারে। কখনো আষ্টেপৃষ্টে বেঁধে মারে গোটা আবাদের মানুষকে। কখনো একলা পেলে খায় ঘাড় মটকে। তাই গোটা নদীর পাড় জুড়ে বাঁধ। তার নোনা জল একটু চুঁইয়েও যাতে ঢুকতে না পারে মানুষের আস্তানায়। সে ফসল খায়, আর নিদেন তিন বছরের মতো মাটিকে দিয়ে যায় বন্ধ্যা করে।

এ জল স্পর্শেও ভয়। তাই কেউ পায়ের পাতা ডুবিয়েও দাঁড়ায় না এক দণ্ড। সে তার লকলকে জিভ দিয়ে যেমন খোঁজে বাঁধের ফুটো ফাটল, তেমনি খোঁজে মানুষ। সংসারের সেরা জীব, বড় মিষ্টি যার মাংস। পেলে গরাস ভরে যতটা পাবে, ততটাই নিয়ে যায়। বাকিটুকুতে প্রাণ যদি থাকে, সেটুকু থাকে শুধু বিভীষিকার ঘোরে খাবি খাওয়া।

বাঁকা স্রোতের পাকে পাকে ছোট ছোট ঢেউ চলকানির কোনখানে সেই হিংস্র ভয়াল কামট ওত পেতে আছে কেউ জানে না। সেদিক দিয়ে কুমীর রাজকীয়। অন্তত কাছাকাছি এসে সে জানান দেয় একবার। কামট যখন ধরে তখনো টের পাওয়া যায় না, দেখাতো দূরের কথা। তাই সে থাকে মানুষের কাছে কাছে, তার তীক্ষ্ণ করাতের মতো দাঁতে দাঁত চেপে, ধূর্ত চোখের সতর্ক সন্ধানে, চতুর চলাফেরায়।

জোয়ারের জলে ঈশান বিনজাল পাতে আর এদিকে ওদিকে তাকায়। উত্তর-দক্ষিণে নদী, পুবে পশ্চিমে আড় নৌকো। জাল পাতে ছড়িয়ে ছড়িয়ে, আর তাকায় দূরে অদূরে, যেখানেই জল একটু বেশী চলকায় ঢেউয়ের মাথায়, যেখানেই একটু বেশী শিউরে ওঠে বাতাসে। তীক্ষ্ণ শিকারীর চোখে উৎকর্ণ হয়ে কী যেন খোঁজে সারা পেতনির জলের জোয়ারের কলকলানিতে, আর দাঁতে দাঁত চাপে। যেন কামটেরই মতো। কেন? মাছ আসবে জালে, এমন করে তাকাবার কি আছে?

কালো চকচকে শরীর ঈশানের। তলপেটের গভীর খাদ থেকে, চওড়া বুকটা যেন হঠাৎ পাথরের চাংড়ার মতো উঠেছে ঠেলে। শক্ত ঘাড়ের ওপর, চড়ানে এবড়ো-খেবড়ো পাথুরে মুখ। শ্যাওলা-কালো কামটের মতো ছোট ছোট চোখ দুটির চাউনিতে টের পাওয়া যায় না—কোনদিকে তাকিয়ে আছে। মাথায় ভেড়ার লোমের মতো কোঁচকানো চুল।

জলের এদিকে ওদিকে ছাখে, তারপরে হঠাৎ ব্যাকুল অবাক চোখে ফিরে তাকায় আকাশের দিকে, ভেড়ি বাঁধের সীমানায়। আবার জাল পাতে। বিনজাল, গহীন তলে গিয়ে পথ আটকে দাঁড়ায় নিঃশব্দে। ওপরে ভাসে ছোল, জালের সীমানা চিহ্ন।

গেমো গাছ মাথা কাটে বাতাসে। রাই মঙ্গলের বুক ভাসিয়ে পেতনিও ফেঁপে ফুলে ওঠে। অস্পষ্ট ভেসে আসে পশ্চিম-পাড় গয়ারমারির মোটরের ভেঁপু। ঈশান থেকে থেকে চমকায়। কী যেন নড়ে উঠল পুবের ওই বাঁকা স্রোতের জলে। আবার ফিরে তাকায় পশ্চিমে। কিসের যেন শব্দ হল ওখানে, পাড় ঘেঁষে। না, কিছু নয়। জোয়ার এসেছে। মাঝে মাঝে বাতাস একটু দুরন্ত হয়ে নাড়া দিয়ে যায়।

ঈশানের সর্পচক্ষু কেমন যেন ধকধক জ্বলে। বাঁশের ফালি পাটাতনের ফাঁক দিয়ে বার করা, ধারালো বর্শার একহাত ফলাটার দিকে তাকায়। ঝকমকে সুতীক্ষ্ম মস্ত বর্শা, ভাদুরে রোদও যেন কেটে খান খান হয়ে যায় তার ধারে। আবার জাল পাতে ঈশান।

পশ্চিম পাড় থেকে আসা একটি নৌকো যায় কাছে ঘেঁষে। গঞ্জে যায়, মোচা, কাঁচ-কলা, আর কেওড়া ভরতি চুপড়ি নিয়ে। কেওড়া এক রকমের টক ফল, অম্বল রান্না হয়। নৌকোটির হালে যে বুড়ো বসেছিল, সে ডেকে বলে, ঈশান নিকি গো?

মুখ না তুলে জবাব দেয় ঈশান, হাঁ।

বুড়ো আবার বলে, গোন তালি তিন দণ্ড আগেই এইসেছে, অ্যাঁ?

ঈশান জাল পাতে আর শুধু শব্দ করে, হুঁ।

গোন বলতে জোয়ার বোঝায়।

এবার একটি মিষ্টি মেয়ে-গলায় ডাক শোনা গেল, অ ঈশেনদাদা, ছোট মাছ পেলি আমারে একখানা দেবা?

ঈশান ফিরে তাকায়। সেই অন্ধ মেয়েটা। লোকে বলে কানী। নাম বিমলা থেকে বিমলী। থাকে পশ্চিম-পাড়ে। ভিক্ষে করতে আসে রোজ গঞ্জে। পাড়ে এসে বসে থাকে। যাকে পায়, তাকেই পার করে দিতে বলে। এপারে ওপারে দু পারেই।

চোখের সামনে ছোট থেকে বড় হল মেয়েটা। ছ' থেকে আঠারোয় উঠেছে। ছেউটি পেতনির টান ভাটার জলে এসেছে জোয়ার। একটা হাত সরু আর ছোট, কানী বিমলী কেমন যেন মায়াবিনীর মায়া মেখেছে সর্বাঙ্গে।

তবে ভিক্ষে করতে বসেও রেহাই নেই। সব সময়েই চেঁচাচ্ছে, 'আ'মলো বিষ্টাখেগোর ব্যাটা, গায়ে হাত ছ্যায় কোন ঢ্যামনা। তোর মার গায়ে হাত দিতি পারিস্ না?' তারপর ঠ্যাং ছড়িয়ে বসে কাঁদে। হাটের দিনে একটু দেরি হয়। তখন সন্ধ্যার অন্ধকারের ঝোঁকে, বাঁধের আড়ালে কিংবা গেমো গাছের জঙ্গলে টেনে নিয়ে গেছে কয়েকবার। যেমন ছাড়া হাঁস-মুরগী ছোঁ মেরে নিয়ে যায় শেয়ালে। বিমলী চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কাঁদে, 'অ'গো মা'গো ছ্যাখ আমার কী কইরেছে। হেই ভগমান, ওরে কামটে খায়না গো, হেই ভগমান, আমার কী দিলে গো-গতরে, আমারে শকুনে খায়।'

কাঁদে, দাপায় চুল ছেঁড়ে, আবার শান্ত হয়। হেসে কথা বলে বেশ লোকের সঙ্গে, 'ও করালী খুড়ো, যদি দুটো পয়সা দিলা, ত' আমারে এটটু উত্তোর বেলে বসাইয়ে দে' যাও। খুড়ি ভাল আছে ত? মাল বিকোলে কেমন্থ?' আশেপাশে সব লোকের সঙ্গেই তার ভাব।

ঈশান মুখ ফেরাতে গিয়ে আবার ফিরে তাকায়। যেন চমকে ফিরে তাকায় তার ছোট ছোট সাপ-খপিস্ চোখে। কী যেন ভাবে কানী বিমলীর দিকে চেয়ে। তারপর বলে গোঙানির স্বরে, 'তা পেলি পরে দেখা যাবেনে।'

বিমলী হাসে। গর্তে বসা চোখ দুটির অন্ধকারে পেত্‌নির জলের ঘোলা-নীল আভা যেন চিকমিক করে। পরনে একখানি আট হাত পুরনো ডুরে শাড়ি। বাতাসে সেটি উড়ু উড়ু করে। হাত দিয়ে কাপড় সামলে বলে, 'দেবা ঈশেন দাদা? তা'লি আজ নিচ্ছয় কইরে মাছ পাবো।'

ঈশান জবাব দেয়না। কিন্তু জাল পাততে পাততে, আড় চোখে তাকায় বিমলীর দিকে। পাথুরে কপাল বেয়ে গাছের শিকড়ের মতো কয়েকটা শির ফুলে ওঠে। তারপর দাঁতে দাঁতে চেপে ফিরে তাকায় জলের দিকে। বিন্‌জাল পাতে পুবে পশ্চিমে ছড়িয়ে। হাল রাখে কোলে, অর্থাৎ পায়ে।

পেতনি নদী হাসে জোয়ারের গরবে।

যে নৌকোটি হাটে গেল, তার হালে-বসা বুড়ো একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, সন্‌সার বড় তাজ্জব জায়গা। এ ঈশেন কী মানুষ ছেল, আর কী মানুষ হল। হেইসে, গেইয়ে, নেইচে, কুঁদে ঈশেন মাতাইয়ে রাখত সবারে। সকলের সঙ্গে ভাব-ভালবাসা, হাটের দিনে কত নকশা কইরেছে, হেইসে মইরেছে সবাই। জলে জালখানি পেইতে এখনো গঞ্জে এইসে বসে, ত্যাখনো বইসত। এখুন মুখে রা-কাড়ে না, ত্যাখন কত গল্পঝল্প, গাল-গল্পো। গোন গিয়ে ভাটা পইড়ত, তবু জাল তুইলবার কথা মনে থাকত না।

কানী বিমলীর নিঃশ্বাস পড়ে। দক্ষিণা বাতাস তার রুক্ষ চুলের গোছা উড়িয়ে দিয়ে যায়। ছোট আর বড় দুটি হাত দিয়ে চুল সামলাতে গেলে, আট হাত কাপড়খানি অকুলান হয়ে পড়ে। বলে, হ্যাঁ, সেই ব্যাপারখানার পরে, না ঠাকুর্দা ?

—হুঁ।

ভেড়ি বাঁধের গায়ে ধাক্কা খেয়ে বাতাস আসে। পেতনির জল ফোলে। শুধু দু-জনের কেউই দেখতে পায় না, ঈশান দূর থেকে একনজরে তাকিয়ে আছে বিমলীর দিকে।

বুড়ো আপন মনেই বলে, বড় সোহাগী বউ ছেল সে ঈশেনের। যশোরের মেইয়ে, বউটি বড় দামাল ছেল। সংসারে বাপ-মা নেই ঈশেনের। বউ একলা ঘরে থাকতে পারে না। বলে, 'তুমি যাবা মাছ মারতি, আমি বইসে থাকব বাঁধের উপরে।' তা তাই করত ঈশেন। বউকে বাঁধে বসাইয়ে রেইখে জাল পাততো। তা'পরে বউ নে' ঘুইরে বেড়াইত গাঙে গাঙে। সেই নে'ও কত কথা, হাসি, মস্করা। তা' ও দুটির কোন পেত্যায় ছেল না।...তা একদিন দুটিতে কী যেন খুনসুটি ঝগড়া হল, সে পীরিতের খুনসুটি। রাতদিনই হচ্ছে। সেদিন জাল তুইলে লৌকো বাঁধে ভিড়াইয়ে বউকে ডাকল, 'আয়।' বউ বাঁধের উপর দে' হাঁটা দেল। বইললে, 'আজ আখড়াতলা তক হেঁইটে যাব, লৌকোয় ওটব না।' ঈশেন বইললে, 'আসবি তো আয়, না হ'লি সত্যি সত্যি লৌকো ছেইড়ে দেব।' বউ ঠোঁট টিপে হেইসে বইললে, 'ছ্যাওগে।' ঈশেনও তো সেইরকম। দিলে লৌকো ছেইড়ে। একজন বাঁধে, আর একজন জলে। বেলা ত্যাখন যাই যাই করে। পেতনিতে ভাটা পইড়েছে। ঈশেন লগি মারছে। দুজনাই দুজনারে দেখতি পাচ্ছে। তবু ঈশেন বারে বারেই ডাকে, 'আয় বইলতেছি, না হলি আজ তোর কপালে দুঃখু আছে। তা' কে শোনে। বউ মাঝে মাঝে গেমো গাছের আড়ালে পড়ে। আবার দেখা দেয় আর টিপে টিপে হাসে। ঈশেনকে খ্যাপায়। তা'পরে ঈশেন লৌকো নে' সইরে গেল মাঝ নদীতে। বইললে, 'তবে তুই থাক, আমি ওপারে যাচ্ছি।' ত্যাখন বউ লেইমে এইল গেমো গাছের আড়াল থেইকে। খিলখিল কইরে হেইসে ডাক দিল, 'এইস, নে' যাও।' দূর যশোরের মেইয়ে। খলবল কইরে নেইমে এইল পেতনির কোমর জলে। জানতো কিন্তুক মনে ছেল না বউয়ের, পেতনির জলে পেতনির মায়া আছে। ঈশেনের অবস্থাটা ভাবো। চীৎকার দিলে, আলো সব্বোনাশী, শীগ্‌গির ডাঙায় ওঠ, শীগগির।' আর উইঠতে হল

না। ঈশেন দেখল, বউকে কে টেইনে নে' যাচ্ছে জলের তলায়। তা'পর আবার ভাইসলো। ত্যাতক্ষোনে হাল মেইরে এইয়েছে ঈশেন। টেইনে তোললো বউকে। দ্যাখে, তল পেটের কাছখান থেইকে একখান উরত-শুদ্ধু পা নেই। যে ছেল জলের তলায়, সে ছেল তক্‌কে তক্‌কে। নাবালের এই য্যাতো নদী, সবখানে সে হাঁ কইরে আছে। বাগে পেইলে ছাড়ান নেই।··· তা' কামটের কাটা, পচন ধরে সঙ্গে সঙ্গে। বউটা মইল। তা' ঈশেনও হাসি ভুইলে গেল। এখন য্যান কেমন কেমন লাগে। গোনে পাতে বিনজাল কচাড় জাল টানে পাতে। আর ওই চুপচাপ গাঙে বইসে থাকে, না'হলি গঞ্জের বাঁধে।······

ভাদুরে রোদে বিমলীর চোখের গর্ত চিকচিক করে পেতনির ঘোলা-নীল জলের মতো। বড় উদাসিনী দেখায়। যেন চুপি চুপি বলে, হ্যাঁ, চ'ক থাকতিও মানুষ এমন কইরে মরে ঠাকুর্দা। আমি বেইচে থাকি।

দুজনে শুধু দেখতে পায় না, জাল পাতা সাঙ্গ করে, ঈশান দূর থেকে অপলক চোখে তাকিয়ে থাকে কানী বিমলীর দিকে। আর সাপ-খপিস চোখ দুটি জলে ধকধক করে। কী যেন আঁচে মনে মনে। তারপর চমকে ফিরে ফিরে তাকায় জলের দিকে। কি যেন পাক খেয়ে যায় ওই দূর উত্তরের জলে? কিসে যেন ঝটকা দিল দক্ষিণের কোলে? তীক্ষ্ণ ফলা বর্শাটার দিকে চোখ পড়ে ঈশানের।

না, কিছু নয়। সমুদ্রের জোয়ার আসে পেতনির বুক ফাঁপিয়ে। বাতাসে মাথা কোটে গেমো বন।

ঈশান নৌকোর মুখ ফেরায় গঞ্জের দিকে। কিন্তু জলের এদিকে ওদিকে তাকায় বারে বারে। সেই খিলখিল অন্তিম হাসি শোনে নাকি বউয়ের? ছায়া দ্যাখে নাকি সেই সোহাগীর, পেতনির জলে। মন বুঝি কাঁদে।

না। ঈশান খোঁজে জলের সেই অদৃশ্য শমনকে। যাকে কখনো দেখা যায় না, কিন্তু যে আছে তারই কাছে কাছে, ছায়ায় ছায়ায়। শ্যাওলা-রং সেই ভয়াল চতুর হিংস্র যম, বিশাল দেহ আর কুতকুতে চোখ। সে চোখ মিটমিট করে হাসে আর দ্যাখে ঈশানকে। তাই ভাবে ঈশান। একবার কি ভাসে না ওপর জলে? ভীরু ঢ্যামনা। লুকিয়ে ফিরিস গহীন জলের অন্ধকারে।

কালো পাথুরে চোয়ালের ওপরে কুতকুতে চোখ জলে দিবানিশি ঈশানের। যেন হিংস্র কামটেরই মতো।

মনটা আজকে এসে ঠেকেছে এইখানে। শোধ চায় ঈশান, জীবনের একটা প্রতিশোধ। একটা কামটকে চায় সে হাতের কাছে, যে এক গরাসে খেয়ে নিয়েছে সেই শেষ খিলখিল হাসি, সেই শেষ ডাক, শেষবার আসার বায়না।

ঘরে গেলে থাকতে পারে না। বউ যেন হেসে ছুটে আসে। বক্ষলগ্ন হতে। আর সতর্ক সন্ধানী হিংস্র শমন তাকে কোথায় টেনে নিয়ে অদৃশ্য হয়। আখড়াতলা থেকে আসবার পথে ফিরে যাবার অন্ধকারে ও জ্যোৎস্না রাত্রে, গেমোবনের তলায়, পেতনির জলে সেই হাসি শোনে, 'এইস, নে' যাও।' বুক ফাটে। জানে, সে আছে কাছে কাছে। মানুষের গন্ধ পায়, সেই গন্ধে গন্ধে ফেরে। বর্শাটার ফলায় হাত ছায় ঈশান। কোথায়! ওই যে জল ওখানে ? নাকি, ওই যে স্রোতটা ল্যাজের ঝাপ্টা দিয়ে যায়, ওখানে! কোথায় ?

শোধ চায় ঈশান। সেই নেশাই ভুলিয়ে রেখেছে সোহাগী বউয়ের সব শোক। এই নেশাটা কাটলে সে ঘরে গিয়ে মাথা কুটে দাপিয়ে মরে যাবে হয়তো। এখন শোক নয়, শোধ চায়। যদিও বউ বাঁধের উপরে উপরে ফেরে হাসে, খুনসুটি করে, চুল এলিয়ে পাগলি সাজে, তার আঁচল ওড়ে বাতাসে। যদিও চোখের কোণে ডাকে ইশারা করে। পেতনির জল কলকল করে, গেমোগাছে বাতাস শনশনিয়ে মরে। ওসব যে খেয়েছে, তাকে চায় ঈশান।

তাকে চায়, তাই মাছ মারার অছিলায় বিনজাল পাতে গহীন জলে। বিনজাল যায় সেই পাতালে। জোয়ারে বিন, ভাটায় কচাড়। ওই দুই জালে কখনো সখনো ধরা পড়েছে কামট। গভীর জলের জানোয়ার। আড় মাছের আকৃতি, শ্যাওলা-কালো রং, ওজনে পাঁচ থেকে দশ মণ, কিন্তু বিন্দু বিন্দু চোখ। চামড়া শুয়োরের মত মোটা। তাই দেশী কামারের গড়া দেশী লোহার বর্শা নেয়নি সে। কামটের গায়ে তা বিঁধবে না। গঞ্জের মহাজনকে দিয়ে কলকাতা থেকে আনিয়েছে ইস্পাতের বর্শা। তীক্ষ্ণ তার ধার। রোদও কাটে থান থান হয়ে।

ধরা পড়লে আদিবাসীরা তার মাংস খায় হাঁড়িয়ার সঙ্গে। ঈশানও খাবে কামটের মাংস। তারও মাংস মিষ্টি, কেননা সে মানুষ খায়।

পেতনির এই জলে কতদিন ঘুরেছে ঈশান বউ নিয়ে। সোহাগী বউয়ের লোকলজ্জা কম ছিল। কত দিন রাত্রি সে হেসে শিউরে তুলেছে পেতনির

বুক। তার কত প্রেমকুহর একেবারে নির্বাক করেছে পেতনির কলকলানি। আর পেত   রংএ রং মেশানো সেই হিংস্র কামট হয়তো তখন ভেসে উঠে দেখেছে তার সতর্ক চোখে।

সেই একটি শোধ চায় ঈশান। এই নেশাটা গেলে, এদেশে কেমন করে বাঁচা যায়, এই পেতনির ধারে, বাঁধের পাড়ে, গেমোবনের বাতাসে, সেটা জানে না ঈশান।

গঞ্জের বাঁধে এসে নোঙর করল নৌকো। ওই দেখা যায় কানী বিমলী বসেছে, আনাজ হাটের সামনে। আপন মনে হাসছে। ছোট হাতখানি বের করে ভিক্ষে চায়। আসল হাতটি দিয়ে শরীর আর কাপড় সামলায়। ডাঙার কামটেরা বড় বেশী চেতন এনে দিয়েছে ওর দেহ ও মনে। ওর অন্ধ জীবনের একটা নিরালা কোণ আছে। একটু নিরালা ঠাঁই নেই তার যৌবনের। সে-ই না বিমলীর দুঃখ। গেমো গাছে বাতাস আসে, পেতনির জল কলকল করে। বাঁচার জন্যে ভিক্ষে করে বিমলী। তবু বাঁচায় কেন সুখ নেই?

বিমলীর বুক উজিয়ে নিঃশ্বাস পড়ে, অন্ধ, এক হাত ছোট বিমলী। ওর জোয়ার-ঢেউ শরীরের মায়াবিনী রূপ দেখে সবাই।

তার দিকে অমন অপলক সতর্ক সন্ধানী হিংস্র চোখে কী গ্যাখে ঈশান।

শোধের নেশায় গ্যাখে। পাপ ঢুকেছে এখন শোধের নেশায়।

ও নেশায় মধ্যরাত্রে, পেতনির জোয়ারে নৌকোয় নিয়ে গিয়েছিল দশ মাসের ছাগল। দূর দক্ষিণে গিয়ে তাকে ফেলেছিল কামটের টোপ করে। নৌকোয় বাঁধা ছাগলের শরীর ডুবেছিল। ছাগলটা ডাকতে পারেনি। খাবি খেয়ে মরেছিল। ঈশান বল্লম হাতে সারা রাত কাটিয়েছে পেতনির বুকে। আর যেন দেখেছে, চতুর জানোয়ার কেবলি পাক খাচ্ছে আশেপাশে, টোপ গিলছে না।

শেষরাত্রে শুধু দপ্‌দপ্‌ করেছে ঈশানের কামট-হিংস্র চোখ। গালাগাল দিয়েছে অশ্লীল ভাষায়। তারপর মরা ছাগল ছেড়ে দিয়েছে জলে। পেতনি তখন ভাটা-মুখে গেছে নেমে।

দুপুরে দেখেছিল, দুটি শিং শুদ্ধ সেই ছাগলের আধ-খাওয়া মুণ্ডুটা ভেসে এসেছে জোয়ারে। যার টোপ্‌ সে খেয়েছে ঠিক।

জলের দিকে তাকিয়ে দেখেছিল ঈশান। মনে হয়েছিল, নৌকোর পাশে পাশে আছে সে। হাসছে মিটমিট করে। শুধু দেখা যায় না।

কিন্তু আখড়াতলার শূন্য ঘরে কার সোহাগের আগুন যেন পুড়িয়ে মারে অষ্টপ্রহর। পেতনির বুক থেকে কেবলি ডাক ভেসে আসে, 'এইসো, নে যাও।'

তারপর কিছুদিন পরে, প্রথম রাত্রের ঝোঁকে ভুলিয়ে নিয়ে গিয়েছিল নৌকোয় গঞ্জের একটা কেঁদো কুকুরকে। ফেলে দিয়েছিল নিয়ে দূর দক্ষিণের বাঁকে। কুকুরটা যতবারই সাঁতার কেটে পাড়ে উঠতে গেছে, নৌকো বেয়ে আড়াল করেছে ঈশান। অসহায় কুকুরটা জলে ঘেউ-ঘেউ করতে পারেনি। কেঁউ কেঁউ করে কেঁদে নির্বোধের মত তাকিয়েছে ঈশানের দপ্‌দপ্‌ চোখের দিকে।

ঈশান আঁতিপাতি করে খুঁজেছে পেতনির প্রতিটি তরঙ্গে, প্রতি স্রোতের বাঁকে। কোথায় সেই পলাতক শমন।

মাঝ রাত্রে মরতে মরতে গঞ্জের কুকুরটা ভিন্ন পাড়ে গিয়ে ঠেকেছিল। আর কোনদিন গঞ্জে আসেনি। ঈশানের মনে হয়েছিল, ধূর্ত কামট ঘুরেছে তারই নৌকোর পাশে। আর মিট্‌মিট্‌ করে হেসেছে তার কুতকুতে চোখে।

আজ গ্যাখে ঈশান বিমলীকে। ভাবে, খেয়া পার করতে নিয়ে যাবে আজ কানীকে। কী সুখে বাঁচে ও, এই সংসারে। ওকে দিয়ে শোধ নেবে ঈশান আজ রাত্রে। তাই গ্যাখে সাপের মত চোখে।

নেংটি-পরা ঈশান। নেংটির ট্যাক থেকে বার করে একটি আনি। এগিয়ে গিয়ে হাতে দেয় বিমলীর। বিমলী আনিটা আঙ্গুলে অনুভব করে খুশি হয়ে বলে, কে গো, কে তুমি?

সবাইকেই বলে। যদি চেনা মানুষের হয় তার। হাটের ভিড়, কে-ই বা দেখে ফিরে। যদি গ্যাখে তবে ভাবে, ফোঁসলাচ্ছে কানীটাকে। যেন গোঙা স্বরে জবাব দেয় ঈশান, আমি ঈশেন।

খুশি আর ধরে না বিমলীর, ওমা, তুমি পয়সা দিলে। আ আমার কি কপাল গো। সেই ছ'মাস আগে দিছিলে।

শুনতে চায় না ঈশান। সরে যেতে চায়। ভাবতে চায়, কীভাবে কাজ হাসিল করবে।

বিমলী ডাকে, ও ঈশেনদাদা, শোনো, শুইনে যাও একবারটি।

বল্‌—

—কাছখানে এইস। এইয়েছ?

হাঁটুতে হাত দেয় ঈশানের। বলে ফিস্‌-ফিস্‌ করে, সক্কাল বেলা

আইসতে না আইসতে পোড়ারমুখো বেন্দা আড়তদারটা কি বইলেছে জান? বলে, অ' বিমলী, কী কী সুখে তুই ভিখ্ মাগিস্। আমার আড়তে এইসে থাক, সব পাবি। আমি বইললাম, দূর হও, দূর হও খচ্চর মিন্‌সে। তা' ঈশেনদাদা, হাটে-গঞ্জে মানুষ নেই গো। এত লোকের সামনে খপ্ কইরে আমার গায়ে হাত দেল, শরীলে আমার ব্যাথা করে।

বলে কাঁদে বিমলী। ফিসফিস করে অভিশাপ দেয়। কিন্তু কার কাছে দুঃখ করে বিমলী? তার অদৃশ্য শমনের কাছে?

ঈশান কি বলবে ভেবে পায় না। গ্যাখে বিমলীর দিকে। বলে, হুঁ!

বিমলী কেমন একটু অশ্বস্ত সুখের সুরে বলে, তোমার রাগ হচ্ছে ওদের ওপরে, না? থাক, রাগারাগি কইরোনা য্যান!

সরে আসে ঈশান।

এটা আবাদের গঞ্জ। আশেপাশে গ্রাম নেই, গৃহস্থ নেই! পেতনি নদীর ধার যেন খা-খা করে। কাছে কাছে কিছু আদিবাসীদের ভাঙাচোরা ঘর। চাষের মরসুম গেলে বেকার হয়ে যায়। তখন পেটে খাবার ভাত পচিয়ে নেশা করে মেয়ে-পুরুষ। কতগুলি কাল কাল মেয়ে পুরুষ, কতগুলি শুয়োর আর গঞ্জের বিদেশী কারবারী ব্যাপারী—তাদের জন্য কয়েক ঘর দেহজীবিনীদের বাস।

জলে আছে সর্বনেশে নোনা আর হিংস্র কামট। পাড়ে আছে বেশ্যা, ব্যাপারী, আদিবাসী। এখানে গা বাঁচিয়ে বাঁচতে চায়, গায়ে-জল-লাগা বিমলী। তাও চোখ থাকলে কথা ছিল। বিমলী কানী, কেঁদে কেঁদে বলে, হেই ভগমান, আমি মরিনে কেন?

কোচড় ভরে মুড়ি নিয়ে বাঁধের উপরে এসে দাঁড়ায় ঈশান। মুড়ি চিবুতে চিবুতে তাকায় দূর জলে। পেতনির জল অকূল হচ্ছে। ফুলছে আরো। হাটের দিন আজ। লোকজন আসছে। ঈশান যেন গ্যাখে, শ্যাওলা-কালো জানোয়ারগুলি আজ বড় বেশী ঘোরাফেরা করছে এখানকার জলে। সতর্ক সন্ধানে ওত পেতে আছে, যদি একটা কেউ জলে পড়ে। যতো মানুষ, ততো খাবার তো। করাত-হিংস্র দাঁত কড়মড় করে পেতনির অতলে।

ছাগলের টোপ ফস্‌কে গেছে। বৃথা গেছে কুকুর টোপের হয়রানি। সেরা টোপ দেবে এবার ঈশান। মানুষের অঙ্গ, মেয়েমানুষের শরীর। ঝাপাঝাপি করবে অথৈ জলে। নোনা ছোঁকছোঁকানো যম না এসে যাবে কোথায়, একবার দেখবে।

দপ্‌দপ্‌ করে জ্বলে ঈশানের চোখ। আবার ছ্যাখে বিমলীর দিকে। হ্যাঁ, গায়ে গতরে মাংস আছে কানীটার। পুষ্ট, নিটোল মাংস।

নিরালায় যায় ঈশান বাঁধের উপর দিয়ে। নৌকোগুলি এত দোলে কেন কিনারায়? জল ফোলে, তাই। পেতনি বাড়ে, অতল হয়, সে আসে তলে তলে।

গেমো বন ঘন হয়, পূবে বাতাস তার ঘেটি মোচড়ায়। গঞ্জের দেহপসারিণীরা ছুটে আসে বাঁধে। কামটের মতো। দেখতে আসে, লোকের যাওয়া আসা কেমন হচ্ছে। এখন যেন তারা আবাদের গঞ্জে নির্বাসিতা। মরসুমে কারবার জমে।

বাঁধের উপর এসে হাসে খিল্‌খিল্‌ করে। কেন? কোন্ মাঝিকে দেখল পেতনির জলে। নামবে নাকি কোমর জলে? বলবে, 'এইসো নে যাও।'

আবাদের মাঠ ভেঙ্গে বাতাস আসে পূব-সাগরের। পেতনির কোমর জলে কেউ হাসে নাকি খিল্‌খিল্‌ করে। কোনো সোহাগী?

না। শুনলে পরে, বাঁচে কেমন করে ঈশান। সে শোধ চায়।

—কী ছ্যাখো গো ঈশেনদাদা।

জিজ্ঞেস করে একটা মেয়ে। সকলেই চেনাশোনা। বউ মরার পর মানুষটা মেয়ে পাড়ায় যায়না। সেইটা এক বিস্ময়। বড় বিস্ময়, লোকটা পাগল হয়ে গেছে।

ঈশান বলে, জাল দেখি।

জাল ছ্যাখে ঈশান। ওই দেখা যায়, বিনজালের ছোল্‌ ভাসে। আট্‌কা পড়বে নাকি একটি আজ। বিনজালের বাঁধনে দাঁত খুলতে পারবে না। বেরিয়ে যাওয়ার উপায় কম।

কিন্তু আটকা পড়েনা একটাও। টোপ্‌ চায়।

হাটের মধ্যে ফিরে আসে ঈশান। বিমলীকে ছ্যাখে। একটু বেলায়, ময়রার দোকান থেকে গরম জিলিপি নিয়ে আসে কিনে। ঠোঙা দেয় বিমলীর হাতে। বলে, খা, তোর জন্যে এইনেছি।

বিমলীর চোখের অন্ধকারে বিস্মিত খুশী উপ্‌চে পড়ে। বলে, কেন গো ঈশেনদাদা।

ঈশান মাথা তুলে নদীর দিকে তাকায়। চোখ যে বড় দপ্‌দপায়। দিলাম, খা।

টোপ মজায় ঈশান। বিমলী যেন কী ভেবে মিটি-মিটি হাসে। আচলখানি টেনে দেয় বুকে ভাল করে। বলে, তুমি খাবা না ঈশেনদাদা।

ঈশান জবাব দেয়, খেইয়েছি। তোর জন্যে আন্‌ছি ওগুলোন।

কানী বিমলী সলজ্জ হেসে জিলিপি খায়।

ঈশান গোঙাস্বরে আস্তে আস্তে বলে, অ-বিমলী।

—আঁ?

—তোরে আজ আমি পার কইরে দিয়ে আসবেনে, আঁ?

একটু অবাক হয়ে হাসে বিমলী। বলে, দেবা, সত্যি? তবে বড় নিচ্চিন্ত হই ঈশেনদাদা।

ঈশানের দাঁতে দাঁত বসে। বলে, দ্যাব। বিকেলে, রহমানের আড়তের কাছে বইসে ভিক্ষে করিস্, ওখেন থেইকে নে'যাব।

বিমলী ভাবে, কেন, অত নিরালায় কেন? আবার হাসে মিটি-মিটি বলে, আচ্ছা। যা বল।

ঈশান বাঁধের উপর যায়। রোদ বড় চড়া। পেতনি ঝিকি-মিকি করে। বাতাসটি বড় আরামের।

দুপুরে জাল তুলতে গিয়ে, জাল বড় ভারী লাগে ঈশানের। ওকোড় কাছি টানে, জাল উঠতে চায় না, এত ভারী। ঈশানের দু' চোখ হিংস্র উল্লাসে জলজ্বল করে। পড়ল নাকি, পড়ল একটা জালে? কানী বিমলীর ভাগ্য নিয়ে?

আরো জোরে টানে ঈশান। জাল উঠে। গড়ান গাছের গুঁড়ি একটা প্রকাণ্ড। জালের কোলে আটকেছে।

হতাশ ক্রুদ্ধ চোখে যেন দ্যাখে ঈশান, ধূর্ত কামট পাক খায় তারই নৌকোর আশেপাশে।

বিনজাল তুলে, কচাড় জাল পেতে, আবার গঞ্জে ফেরে ঈশান।

মরসুমের হাট নয়। সন্ধ্যা হতে না হতেই ভাঙন ধরে।

রহমানের ধানের আড়ত বন্ধ। এখন ধান নেই! লোকজন কম এদিকে। বিমলী বসে আছে এক কোণে।

এদিক-ওদিক দ্যাখে ঈশান। কারুর নজর নেই এদিকে। কে-ই বা দ্যাখে। ঈশান ডাক দেয়, চল বিমলী।

বিমলী যেন হুতোশে ছিল। মিঠে ব্যাকুল গলায় বলে, এইসেছ? বড় ভয় পেইয়েছিলাম, কী জানি, ভুইলে গেলে কিনা!

নেংটি পরা ঈশান, কোমরে বাঁধা গামছা। নিকষ কালো মূর্তি, এখন যেন আরো শক্ত দেখায়। বিমলীর হাত ধরে নিয়ে যায় বাঁধের উপর। গেমো গাছের গোড়ায় বাঁধা ছিল নৌকো। বিমলীকে তুলে, বাঁধন খুলে ঈশান নৌকোয় ওঠে।

এখনো ভাটা চলেছে। পেতনি হাসছে খিল্‌খিল্ ক'রে। যাবার বেলায় হাসে, আসার সময় চুপি চুপি আসে। অদৃশ্যে জিভ্ বাড়িয়ে বাঁধের ফাটল খোঁজে। আর খোঁজে মানুষ।

গেমো গাছ বড় বড় নিশ্বাস ছাড়ে যেন। বাঁধের মাথায় চাঁদ উঠেছে পঞ্চমীর। অস্পষ্ট আলো-ছায়ায়, গাছ, বাঁধ, জল, সবই যেন কেমন আড়িপাতা লুকিয়ে থাকার মতো রহস্যে ভরা।

ঈশানের পাথুরে কপালের ছায়ায় কোন্ গর্তে ঢোকা অপলক দুটি ছোট ছোট চোখ। নৌকোয় উঠে বিমলীর হাত ধরে আবার বলে, হালের কাছে গলুয়ে গে' বসবি চল।

হালের কাছে? কেন? ঈশানের কাছে কাছে বসতে হবে? পেতনির জলের মতো হাসি চিক্‌চিক্ করে বিমলীর ঠোঁটে। বলে, চল।

ঈশানের নজর পড়ে না বিকেলে কোন ফাঁকে কানী বিমলী আজ চুল বেঁধেছে তেল জল লাগিয়ে। দেখেনি, পান খেয়ে ঠোঁট লাল করেছে কখন। এখন ডুরে শাড়িটি বড় বেশী ছোট লাগছে তার। কেন? শরীর কি আরো ফাঁপল?

বিমলীকে গলুয়ে বসিয়ে, নিজে তার পিছনে বসে হাল ধরে ঈশান। কোমর থেকে গামছাখানি খোলে নিঃসাড়ে। মুখ না বাঁধলে চেঁচাবে মাগী। মুখ বেঁধে, কোমরে দড়ি বেঁধে, গলুয়ের সঙ্গে ঝুলিয়ে রাখবে। তাই কাছে কাছে রাখতে চায়।

গামছাটা কোলের উপর রেখে, নৌকোর মুখ দক্ষিণে ঘোরায় ঈশান।

এখনো দু'চারটি নৌকো এদিক-ওদিকে যাতায়াত করে। গয়ারমারির শেষ মোটরের ভেঁপু আসে ভেসে।

ঈশান জলের দিকে তাকায়। ঘাড়ে কপালে দপ্‌দপ্ করে শিরা উপশিরা। উঁচু ভ্রূর তলায় জ্বলে এখন সাপ-খপিস চোখ। দ্যাখে, ভীরু যম এসেছে আজ তার নৌকোর ছায়ায়। মরণের ভয় ডিঙিয়ে এসেছে আজ আসল টোপের লোভে। ওই যেন পাক খায় শ্যাওলা-কালো বিশাল শরীরের ঝাপটায়। দ্যাখে কুতকুতে চোখে, করাত-দাঁতে দাঁত ঘষে।

মনে মনে বলে ঈশান, আয়, একটু দূরে আয়। জীবনের এই একটা শোধ চাই আজ। আর কিছু না।

দূরে যায় ঈশান। নামে পেতনির টানে। পাটাতনের পাশ থেকে টেনে বের করে সুদীর্ঘ বর্শা। কুহকী জ্যোৎস্নায় বড় বেশী হিংস্র দেখায় ইস্পাতের বর্শা-ফলা।

যেন ভুলেই গেছল, হঠাৎ চমকে ওঠে বিমলীর গলার স্বরে, কী কর ঈশেনদাদা ?

কী করে ঈশান ? বলে, লৌকো বাই।

নৌকো বায় ? বৈঠার শব্দ নেই, নৌকো দোলে না কেন ? বড় যে এক বর্গা যায়। বিমলী মিটিমিটি হাসে কুহকী জ্যোৎস্নার মতো। বলে, ওপারে যাবা না ঈশেনদাদা ?

চমকায় ঈশান। তীক্ষ্ণ চোখে তাকায় বিমলীর দিকে। কেন, চোখে কি ঠাহর পায় নাকি কানী ? বলে, তাই তো যাই। কেন ?

বিমলী সলজ্জ হেসে বলে, পূবে বাতাসটা মুখে লাগে, মনে নেয়, দক্ষিণে চইলছি।

ঈশান বলে, জাল পেইতেছি একটু দূরে। একবার দেইখে যাব।

—অ !

বিমলীর চোখের কোলের অন্ধকারে চাঁদের কণা চিক্‌চিক্ করে।

ঈশানের হিংস্র চোখ চমকায়। কী আসে পাক খেয়ে ওই দক্ষিণের বড় বাঁকে। কী যেন চল্‌কে ওঠে নৌকোর তলায়।

এসেছে তারা। দলে দলে এসেছে মানুষের গন্ধ পেয়ে। সেই শেষ খিল্‌খিল্ হাসিটা খেয়ে এসেছে, গিলে এসেছে শেষ ডাকটা, 'এইস, নে' যাও।…এইস, নে' যাও।'…

সেটা ভাবতে চায় না ঈশান। তা' হ'লে বাঁচা যায় না। শোধ চায়। জীবনের এই একটা শোধ। এই জন্যে সে বেঁচে আছে। আদিবাসীরা তার মাংস খায়। ঈশানও খাবে।

বাঁধ নির্জন, পেতনির বুক নিরালা, গেমোবনে বাতাস ডাকে।

মাথায় রক্ত ওঠে ঈশানের। গামছাটা তুলে নেয় হাতে।

বিমলী ডাকে, ঈশেনদাদা ?

গলাখানি যেন বড় মিষ্টি বিমলীর, মায়াবিনীর কুহক মাখা। ঈশান শব্দ করে, হুঁ।

—চাঁদ উইঠেছে, না ?

বড় চমকায় ঈশান। কানী না বিমলী ? বলে, টের পাস্ কেমনে ?

বিমলী বলে, আইজকে যে পঞ্চমী শোনলাম ?

—হ্যাঁ, চাঁদ উইঠেছে।

পেতনি নাচে, হাসে কল্‌কল্ করে। সমুদ্রের অন্ধকারে যায় কিনা,

তাই। বাঁধের কোল থেকে জল নেমেছে। সেখানে মাটি চক্‌চক্‌ করে।

কিন্তু দেরী হয়ে যায় যে! জোয়ার পড়লে, আবার উত্তরে টেনে নিয়ে যাবে। চারদিকে সুপ্তি। ডাঙায় ডাকে ঝিঁঝিঁ। আর, এই তো ঘিরে ধরেছে তারা ঈশানের নৌকোর চারদিক। যেন ল্যাজের ঝাপটা মারে তারা ক্ষুধা ও লোভের তাড়নায়!

দুটো টোপ গেছে, এ টোপ ফস্‌কাতে দেবে না ঈশান।

ঈশান, প্রায়-উলঙ্গ সেই সমুদ্রের আদিম অধিবাসী, চোখে যার ক্রুদ্ধ জিঘাংসা ধক্‌ধক্‌ জলে। দু'হাতে গামছা তুলে বিমলীর মুখ বাঁধতে যায়।

—ঈশেনদাদা।

থমকে যায় ঈশান।—হ্যাঁ।

বিমলীর সারা মুখে কৌতূহল। বলে, পিঠে কী ফেইল্‌লে আমার?

টনক বড় খাড়া কানীর। ঈশান বলে, কিছু না, গামছাখানা পইড়ে গেছে।

কিন্তু জোয়ার যে অনেকক্ষণ রাইমঙ্গলের মোহনা পার হয়ে এসেছে। সময় যায়।

বিমলীর মুখে জ্যোৎস্না যেন বিষণ্ণ হ'য়ে ওঠে। বলে, ঈশেনদাদা তোমার পরাণটায় বড় দুঃখু, না?

—কেন?

—আমি জানি। তাই তুমি রা' কড়ো না।

কে যেন ক্রুদ্ধ স্বরে চিৎকার করে ঈশানের বুকে, ওরে মুখ বাঁধ, শীগ্‌গির বাঁধ। দেখিসনে, তোর সোহাগী বউয়ের শেষ হাসি, শেষ ডাক—খাওয়া শমনেরা ধরা দিতে এসেছে। ঘুরছে আশেপাশে, মানুষের গলার স্বরে, জীবন্ত মাংসের গন্ধে।

চকিতে বর্শাটা তুলে নেয় ঈশান। কিসের ছায়া ওটা জলে?

কিছু না, পেতনির বুকে জ্যোৎস্নার খেলা।

বিমলী বলে, কী কর ঈশেনদাদা।

—বৈঠাটা সরাইয়ে রাখি।

হাল ছেড়ে দিয়ে, আর একটু এগিয়ে আসে ঈশান বিমলীর দিকে। মজা টোপ, পচে না যায়। আর দেরী করা যায় না।

বিমলী বলে, দূর বনের বাতাসের মত, তাই তো বলি ঈশেনদাদা, সন্‌সারে ভাল মানুষের মরণ হয়। আমারে কেন খায়না কামটে?

ঈশানের চমকানিতে নৌকোটা শুদ্ধ যেন কেঁপে ওঠে। তার গোঙা স্বর বড় তীক্ষ্ণ শোনায় ; কেন !

পেতনির মায়া জল গড়ায় বিমলীর চোখের গর্তে। বলে, আমি লুলা কানী।

অস্থির হ'য়ে গামছাটা পাকায় ঈশান। ছাখে, কানী বিমলীর বাঁধা চুল বড় চক্‌চক্‌ করে। ঠোঁট লাল।

আর পেতনির জলে লোভী কামট লোভার্ত হ'য়ে ফেরে। ঈশানের হাতে তারা আজ প্রাণ দিতে এসেছে।

পেতনি থম্‌ খায়। জোয়ারের ধাক্কা লেগেছে অদূরে। সময় যায়। টোপ বুঝি ফস্‌কায়।

ঈশান গামছা তুলে নিয়ে যায় বিমলীর মাথার উপর দিয়ে।

বিমলী সরে আসে ঈশানের কোলের কাছে। কুহকী জ্যোৎস্নার বিষণ্ণতা যায়, মিট্‌মিট্‌ হাসে। বিমলী বলে, ঈশেনদাদা, আমার গলায় বড় লাগে।

—অঁা ?

—হ্যাঁ, গামছার পাকে বেন্ধে ফেইলেছ আমারে। এট্টুসখানি আস্তে বান্ধো, না' হ'লি যে বড় লাগে ?

—অঁা ?

বিমলী হাসে খিল্‌খিল ক'রে। ঈশানের পা'য়ে হাত দেয়। তারপর হঠাৎ গুন্‌গুন্‌ ক'রে ওঠে,

মন যদি দিলে
তবে মনের মানুষ নাই কেন।
এতই কাঁদালে যদি,
আজ ভালবাসা কেন।
এ পরাণে কী আছে আর,
কী বা দেখ আর বার,
আগুনের আঁচ নেই
ফুঁ দিয়ে ছাই ওড়াও কেন।

পেতনি নদীর বুকে জোয়ার আসে চুপি চুপি। গেমোবনে বাতাস বড় শন্‌শন্‌ করে। নদীর সর্বাঙ্গ শিউরোয়। বাঁধের ঢালুতে চাঁদ যায় গড়িয়ে। আর মানুষের গন্ধে গন্ধে ফেরে, ভয়াল করাল মাংস লোলুপ কামট। চোখে তার রক্তের তৃষ্ণা। সোহাগী বউয়ের শেষ হাসি খেয়ে এসেছে তারা।

আর শেষ ডাক, 'এইস, নে' যাও !'

কিন্তু ঈশান কী করে। সময় যায় না ?

কানী বিমলী বলে মায়াবিনী স্বরে, ঈশেনদাদা তোমার হাতের বাঁধন এট্টুস্ আল্‌গা কর গো, বড় শক্ত।

বলে বিমলী মাথাটি এলিয়ে দেয় ঈশানের শক্ত বুকে, বাঁধন আল্‌গা হয় ঈশানের।

বাতাসে যেন বড় সোহাগ উথ্‌লায়। বিমলী বলে, দম বন্ধ নাকি তোমার ঈশেনদাদা।

—হ্যাঁ।

—কেন ?

—জলে আমি কামট দেখি।

—কামট !

—হ্যাঁ।

চমকে উঠে, মুখ ফেরাল বিমলী ঈশানের দিকে। বলে, কপালে আমার গরম জল পইড়লো। তোমার শরীল বড় কাঁপে। ঈশেনদাদা তুমি কাঁদছ ?

হ্যাঁ, কালো পাথরটা যেন কিসের দমকে কাঁপে। জলে ল্যাজ আছড়ায় কামট। কিন্তু বাতাসে যেন সোহাগের ডাক ! ঈশান ফিস্-ফিস্ করে বলে, কাঁদি না লো বিমলী, এ পেতনির মায়া।

কি বোঝে বিমলী, কে জানে। তার চোখেও জল আসে।

তারপর জোয়ারের ধাক্কা টের পেয়ে বলে, চল, তোরে রেখে আসি।

বিমলী মিষ্টি করুণ স্বরে বলে, রাত হইয়েছে অনেক। কে নে' যাবে বাড়িতে ! গঞ্জে রেইখে যাবা ?

ঈশান একটু চুপ করে থাকে। দূর জলে তাকায়। নৌকোর মুখ ঘুরিয়ে বলে, গঞ্জে যদি রেইখে যাব, তবে তোরে পেতনির জলে ফেইললাম না কেন ? আখড়াতলা যাবি বিমলী ?

আখড়াতলায় ? ও, সেখানে ঈশেনদাদার বাড়ি। বিমলীর বড় অকুলান লাগে ডুরে শাড়ি। শরীর তার এত বাড়ল কখন ; কবে ? নিরুত্তর চোখের গর্তে কুহকী জ্যোৎস্না চিক্‌চিক্ করে।

ঈশান বৈঠা টানে। পাটাতনের ওপর ইস্পাতের বর্শাটা একটু ম্লান দেখায়। ফলাটা যেন বড় টানা চোখের ফাঁদের মতো চক্‌চক্ করে। কিন্তু পলাতক কামটরা যেন আজ সত্যি বড় হতাশক্রোধে দাঁত কড়মড় করে পেতনির অতলে।

ঈশান ভাবে, বড় খিল্‌খিল্ করে হেসেছে আজ বিমলী। আরো না জানি কত হাসবে।

মান

সুখবতীর বড় ছেলে বেরজো অর্থাৎ ব্রজ এ সংসারের এক মহাবিস্ময়। বলতে কী, এমনটি এ কলিকালে দেখা যায় না। লোকে বলে, ছেলে তো নয়, রতন। সে তুলনায়, ব্রজবিহারীর পর বনবিহারী, অর্থে বুনো। নামে, কামে, স্বভাবে, ও বুনোই। বিধবা সুখবতীর আর আর ছোট ছেলেমেয়েদের এখনো বিচারের বয়স হয়নি। সুখবতীর আসল নাম বেরজোর মা।

ছিল জাতে মালা, এখন জাত নেই। জাতের কাজ থাকলে তো জাত। তা-সে মালার ডিঙ্গি নৌকোও নেই, নেই জাল ঘুনি আটোল। সে সব ঘুচেছে সুখবতীর শ্বশুরের আমল থেকেই, তারা এখন কারখানার মজুর। ব্রজর বাপ মরেছে কারখানার তেলা মেঝেয় পিছ্‌লে গড়িয়ে, মেসিনের তলায় পা কোমর গুঁড়িয়ে।

বড় রাস্তার ধারে আবর্জনা-ভরা পুকুর। তার ধার দিয়ে যে সরু গলিপথটা আরও তিনটে ছায়াঘন অর্ধ কানাগলির মধ্যে হারিয়ে গিয়েছে, সেই পথের ধারে ছিঁটে বেড়া আর খোলার ছাউনির, নসীরামের বস্তি। বার মুখো ঘরের নীচে, স্যাঁতানো সরু পথে যখন ব্রজর মরা বাপকে, সুখবতীর সোয়ামীকে, এনে শোয়ালে, তখন সুখবতী বুক চাপড়ে, চুল ছিঁড়ে কেঁদে চেঁচিয়ে আর বাঁচে না।

ভোরবেলা উঠে ব্রজ মা'কে প্রণাম করে যখন বললে, 'মা তোমার বেরজো রয়েছে, ভাবনা কী.' তখন যেন সুখবতীর পাষাণভার অনেকখানি নেমে গেল।

হ্যাঁ, এমনি ব্রজ, জাতে মালা, থাকে বস্তিতে, তবু এক মহা বিস্ময় সে। হিরণ্যকশিপুর ঘরে প্রহ্লাদ, অসুরের ঘরে দেব-সুত। সে ভোরবেলা উঠে ভগবানকে স্মরণ ক'রে মায়ের পাদোদক খায়, গঙ্গায় যায় নাইতে ; ফোঁটা দেয় কপালে গঙ্গামাটির, জল দেয় তুলসীতলায়, দিয়ে আবার মাকে প্রণাম করে। সুখবতী মরমে ম'রে যায়। ভাবে, এ ছেলের মায়ের যুগ্যি নয় সে। নিজেদের জাত বংশে দূরে থাক, এ যে বামুন কায়েতকেও হার মানায়।

ব্রজর নেই নেশা ভাঙ, নেই মুখে দুটো কটু কথা। ছেলে মুখ তুলতে জানে না, হাজার চড়ে সুখবতীর এ ধম্মিষ্টি ব্যাটার মুখে রা নেই। বোল্‌তার ঠাস বুনোন চাকের মতো এ বস্তিতে হাজারো ইতরের বাস, হাঁকাহাঁকি, খিস্তিবাজী নোংরামি, ঝগড়া, যেন গুল্‌জার করা নরক। কিন্তু কেউ কোনদিন এঁদের সঙ্গে একটা কথা বলতে দেখেছে ব্রজকে ? নাওয়া খাওয়া, শোয়া, এ ছাড়া ব্রজ

এ তল্লাটে থাকে না। তার বন্ধু-বান্ধব সব ভদ্র-পাড়ায়। বামুন-কায়েতের লেখাপড়া-জানা অবস্থাপন্নদের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব।

বস্তির সবাই সসম্মানে ব্রজর কাছ থেকে দূরে থাকে, হিংসে করে সুখবতীর পুত-ভাগ্যিকে। মায়েরা বলে ছেলেদের, 'ব্রজর পাদোদক খেয়ে তোরা মানুষ হ'।'

পাওয়ার হাউসের সি, এ, পার্সেনের কণ্ট্রাক্টরের আণ্ডারে কাজ করে ব্রজ। বাঙ্গালি ফোরম্যান সাহেবও বড় ভালোবাসেন ব্রজকে। খালাসী তার ডেজিগনেশান, কিন্তু কাজের বেলায়, ফাইল খাতা বাছগোছ্ করা মেশিনের নম্বর টোকা। একটু আধটু লিখতে পড়তেও জানে সে। তার অমায়িক ভদ্রতায় ফ্যোরম্যান খুশি, প্রতিদানে মর্য্যাদাও দিয়েছেন, আশাও দিয়েছেন ভবিষ্যতে তাকে বাবু ক'রে দেওয়ার, মানে কেরানি।

পার্সেনের ব্রজর সব খালাসী মজুররা এতে অস্বাভাবিক কিছু দেখে না। সত্যি, ব্রজ তাদের তুলনায় বড়ই। সে ভদ্রলোক। ফলে তাদের সঙ্গে পোট খায় না।

ব্রজ অজাতশত্রু। এক কথায়, দেশে এমন গুণে ছেলে আর হয় না।

সুখবতী নাম সার্থক এ-সৌভাগ্যে। আবার দুর্ভাগ্যজনিত অশান্তির অন্ত ছিল না তার ছোট ছেলে বুনোকে নিয়ে!

বুনো তার শক্ত রুক্ষ মস্ত শরীরটা নিয়ে দুম্ দাম্ ক'রে আসে, গুপ্ গাপ্ করে খায়, ঘরে বাইরে গলাবাজী ক'রে ঝগড়া করে, মারামারি করে, গলা ফাটিয়ে হাসে, গান করে, মুখ খারাপ করে। তার কোনো কিছুতেই ঢাকা-ঢাকিও নেই, চাপাচাপিও নেই। উদ্ধত অবিনয়ী। 'মা'-ডাকে তার মধু ঝরে না, যেন মাকে খেঁকিয়ে ওঠে। তেলচিটে এক মাথা চুল নিয়ে, মুখে বিড়ি নিয়ে সে কারখানায় যায়, তারপর এখানে সেখানে ঘোরা ফেরা। বস্তির সকলের সঙ্গে তার এ-বেলা ঝগড়া, ও-বেলা ভাব। মর্জিমতো ছোট ভাই-বোনদের কখনো ঠ্যাঙ্গাচ্ছে, আবার কখনো আদরের ঠেলায় অন্ধকার। সুখবতীর সুখ নেই, সারাদিন 'বুনো রে' 'বুনো রে' ক'রে তার পিছে পিছে ফিরছে, কখন কী অনাছিষ্টি বাধিয়ে বসে সেই ভয়ে। হারামজাদা যে যমেরও অরুচি!

কপালগুণে দোষ পায়। একই পেটে তার দেবাসুর ঠাঁই পেল কেমন ক'রে! সুখবতীর চেঁচামেচির, গালাগালির অন্ত নেই বুনোকে ঘিরে।

বুনোর বন্ধুরাও সব ডাকাবুকো। তাদের আচার বিচার নেই। কেউ কেউ নেশাভাঙে সিদ্ধহস্ত। ভদ্রপাড়ায় মান দূরে থাক, আনাগোনাও নেই।

সেও খালাসীর কাজ করে পার্সেনে। ব্রজর মতো তার খাতির নেই। কি গ্রীষ্মের পোড়া দুপুরে আর কি শীতের ভোরের তুহিন ঠাণ্ডায় সে টুকটাক ক'রে বেয়ে ওঠে ইমারতের লোহার ফ্রেমের উপর। ছ' ইঞ্চি রেলিং-এর উপর সমস্ত শরীরের ভার দিয়ে পাঁচ পাউণ্ড ওজনের রেঞ্জ দিয়ে স্ক্রু আঁটে আর হেঁড়ে গলায় চেঁচিয়ে গান গায়:

দেখে তোমার চাঁদ মুখ
পরাণে ধরে না সুখ।

নীচে থেকে ব্রজ অবাক মানে। এই অবস্থায় সে গান গায় কি ক'রে। আবার মানও যায়। এ-সব যে অসভ্যের অনাচার।

ব্রজ বাবু হবে। বুনোর কাছে সেটাও বিস্ময়। বলে আমার পেটে বোমা মারলেও নম্বর টোকা ফোকা হবে না বাবা। আমি হব ফিটার।

ব্রজর পাদোদক খাওয়ার কাহিনী এ-অঞ্চলে বিখ্যাত। বুনোকে কেউ যদি বলে, 'তুইও কেন খাস্‌নে,' বুনো খিলখিল ক'রে হেসে বলে, 'আমার মাইরি লজ্জা করে।' বলে, "শালা সং-এর ঢঙ্"।

মাসের শেষে ব্রজ মাইনে পেয়ে সব মায়ের হাতে তুলে দিয়ে পরে হাত পেতে চেয়ে নেয়, 'মা দুটো টাকা দেবে গো?' বুনোর ও-সব নেই। সে টাকা দুটি পকেটে রেখে বাকিটা মায়ের হাতে ফেলে দেয়। দিয়ে বলে, 'কিপটেমি ক'রো না। আজ এট্টুস মাছ খাইও।'

সে খালি সইতে পারে না ব্রজর তুলনা। কিন্তু তার মা প'ড়ে প'ড়ে সারা দিন তার পেছনে খালি থোক্ কাটবে, 'ব্রজ এই, ব্রজ সেই, আর তুই হারামজাদা—'

ব্যস, আর বলতে হবে না। আরম্ভ হয়ে যাবে বুনোর বুনো ঝগড়া আর গালাগাল। আর ঝগড়ায় তো সুখবতীও কম নয়। সোয়ামী বেঁচে থাকতে রোজ ঝগড়া ছিল, এখন সেটা বুনোর সঙ্গে। এ ড্যাকরা যে বাপের মতো কুচাল পেয়েছে।

আর সইতে পারে না বুনো ব্রজর শাসন। ব্রজ যদি বলে, 'বুনো এটা করিস্‌নে,' বুনো সটান জবাব দেবে, 'তোর নিজের চরকায় তেল দি'গে যা।'

এই সেদিন এক কাণ্ড ঘটলো। পার্সেনের কণ্টাক্টরি কাজ মানেই হলো পাওয়ার হাউসের মতো ও-সব রাক্ষুসে কারখানা তৈরি করা। আর যত ওচা কাজ হলো খালাসীদের। সেদিন একটা খালাসী কী কথায় ফোরম্যানকে বলেছে, শরীরটা তার খারাপ, আজ সে উপরে উঠতে পারবে না।

অমনি ফোরম্যান খিঁচিয়ে উঠলো, 'হারামজাদা, পারবিনে তো চাকরি ছেড়ে দে।'

সামনে ছিল বুনো। সে হেঁড়ে গলায় গাঁক ক'রে উঠল, 'গালাগাল দিচ্ছেন কেন মশাই?'

ফোরম্যান তো থ। ছোঁড়া বলে কী? মুখের পরে কথা? সে-খালাসীটাকে উপরে উঠতে হলো না বটে, কিন্তু বুনোর চাকরি যায় যায়।

ব্রজ এসে ভাইকে বুঝিয়ে বল্‌লে, 'ছাখ্‌ ভাই, ওদের মুখে সব মানায়, তোর মুখে নয়। মাপ চেয়ে নে।'

বুনো একথায় বললে, 'ছাখ্‌ বেরজা, আর একটা কথা বলবি কি ঠেঙ্গিয়ে তোর খপ্‌ড়ি ওড়াবো।'

সে-যাত্রা ব্রজর ভাই ব'লেই বোধ হয় বুনোর চাকরিটা গেল না। কাটা গেল সাতদিনের রোজ আর জন্মের মত সুখবতীর মুখে রপ্ত হয়ে গেল তার প্রতি এ খোঁটা। তাও খেতে শুতে—বসতে।

ভোর হয় হয়। আকাশে ফুটেছে নীলের আভাস। তা' ব'লে নসীরামের বস্তিতে অন্ধকার ঘোচে না। আর ঘরের ভিতর তো অমাবস্যা। দুপুরবেলা কয়েক ঘণ্টা একটু আলো। তারপরেই আবার যে কে-সেই।

ব্রজই সকলের আগে জাগে। ডাকে, 'মা, মাগো।'

গলা যেন মধুভরা। আর কি মিষ্টি ডাক। সে-ডাকে সুখবতী জাগে। ব্রজ ঘটির জলে মায়ের পা ছুঁইয়ে খায়, তারপরে চ'লে যায় গঙ্গায়।

আগে আগে সুখবতীর লজ্জা ও ভয় করতো এমনি ক'রে জলে পা ছুঁইয়ে দিতে। এখন অভ্যাস হ'য়ে গিয়েছে। মনে প'ড়ে যায় শ্বশুরের কথা। ব্রজর ঠাকুর্দা। ব্রজ তার প্রথম নাতি, আদরেরও বটে। সে-ই ব্রজকে হাত ধ'রে ধ'রে নিয়ে গিয়েছে সাধু সন্তদের আড্ডায়, বাবু ভদ্রলোকদের সৎ মজলিসে, কথকঠাকুরের সভায়। সেই থেকেই আস্তে আস্তে দেখা দিল ব্রজর এমনি মতিগতি। ভয়ও হয় সুখবতীর, ছেলে না তার আবার বিবাগী হয়।

না, ভাবলে চলে না। সে ডাক দেয় বুনোকে। 'এক ডাকে তো এ অনামুখো একদিনও জাগবে না। যেন কুম্ভকর্ণের ঘুম।' অনেক ডেকে ডেকে যখন সুখবতী খেঁকিয়ে উঠলো, 'ওরে হারামজাদা লবাবপুত্তুর, তোর কোন্‌ কেনা বাঁদী আছে রে ডেকে দেওয়ার?'

অমনি লাফ দিয়ে উঠল বুনো। যেন এই কথাগুলো না হ'লে তার ঘুমন্ত মরমে পশে না। উঠল হাসিখুসি মুখ নিয়ে। কিসের যে এত খুশি তা সে-ই জানে। হয় তো নিদ্রাটি বেশ জমাটি হয়েছে।

ও মা! তারপরে কথা নেই বার্তা নেই, পা ছড়িয়ে ব'সে সে গান ধরলো:

আমার সুখ হল না দুখে মরি,
ওগো, তোমার ঘর ক'রে।

উনুন ধরাতে গিয়ে সুখবতীর পিত্তি জ্ব'লে যায়, পিত্তি জলে যায় আশে-পাশের ঘরের লোকের, এ-ঘরে ছোট ছোট ভাইবোনগুলোর ঘুম ভেঙে যায়।

সুখবতী চেঁচিয়ে ওঠে, 'হারামজাদা, তোর গানের নিকুচি করেছে। সকালবেলা—'

তাতে বুনোর আবেগ বাগ মানে না, হাত জোড় ক'রে গায়:

সখী, তুমি আগ ক'রো না।

সুখবতী রাগে ঘৃণায় অন্ধ হ'য়ে চীৎকার ক'রে ওঠে, 'শুয়োর, আমি তোর সখী হলুম?'

বুনো তাড়াতাড়ি নিজের মুখে চাঁটি মেরে বলে, 'থুড়ি থুড়ি, তুমি আমার মা।' আবার,

মা গো, তুমি আগ ক'রো না।

ততক্ষণে সুখবতী একটানা ব'লে চলেছে, 'তুই মর্ মর্ মর্—'

বুনো বলে সুর ক'রে,

যম যে তোমার চোখ-খেগো গা—

পরমুহূর্তেই তেলের বাটিতে কোনরকমে আঙুলটা ছুঁইয়ে, সেটুকুন মাথায় ঠেকিয়ে চ'লে যায় পুকুরের দিকে। কিন্তু রাস্তা দিয়ে যায় না। যায় বস্তির পেছন দিকের ঘাটে; যায় না, তাকে টানে ওই ঘাটে।

পুকুরের ধারে, যেখানে বস্তির পেছনটা বেঁকে পড়েছে, সেখানে একটা ঘরে থাকে মাদ্রাজী খ্রীস্টান পরিবার। মা বাপ আর বড় মেয়ে কারখানায় কাজ করে। মেজ মেয়েটা সাহেব বাড়ির ঝি। সেই মেয়েটা, কালো বটে, তবু ভারী সুন্দর। আর কাজ কর্ম করে বটে, কিন্তু সব সময়ই থাকে বেশ পরিষ্কার ধপধপে হয়ে। মেয়েটা বুনোর দিকে ঠেরে ঠেরে তাকিয়ে না-হক্ কেবলি টিপে টিপে হাসে! বুনো প্রথমে চটতো, ভাবতো বুঝি অবজ্ঞা ক'রে বিবিগিরি দেখাচ্ছে তাকে।

কিন্তু এখন, বুনো মনে মনে ব'লে এ আবার শালার কি ফ্যাসাদ, তবু ওই

না-হক্ হাসি না দেখতে পেলে তার প্রাণ মানে না! আর মেয়েটাও ভোলে না ওই এঁদো পুকুরের পাড়ে হাজিরা দিতে।

বুনোর পক্ষে হৃদয়ের এ আবেগ চাপা মুশকিল। কিন্তু ব্রজর কাছে এ-ব্যাপার অকল্পিত। একে তো সে এ-যুগের বিত্তহীন, তার আশাটা হলো এ-সমাজের মধ্যজীবীর ভদ্র জীবনযাত্রা ও ধর্মের একনিষ্ঠতা। তার চারপাশে ভয় ও সংশয়ের প্রাচীর খাড়া, প্রতিটি পদক্ষেপ নিঃশব্দ নম্র সন্ত্রস্ত।

ব্রজ এল চান ক'রে। তাদের উঠোন নেই, আছে রান্না করবার এক ফালি বারান্দা। সেখানেই ব্রজ রেখেছে তুলসীগাছের টব। সে এসে জল দিল তুলসীতলায়। প্রণাম করল মা'কে। তারপর চা খেতে খেতে বললো, 'হ্যাঁ মা, তুমি নাকি ঘোষ কর্তাদের দোকানে গে ঝগড়া ক'রে এসেছ?'

সুখবতী কথাটা বোধ হয় চাপতে চেয়েছিল। বললো 'তা করেছি বাবা। করব না? ছ প'সার তেল, তাও ওজনে মারবে?'

'মারুক, ওদের ধম্মো ওদের কাছে।'

কথাটা সুখবতীর মনঃপূত নয়। তবু ব্রজ যখন বলছে! বলব, 'কিন্তু গাল দিলে যে?'

'দিক, তাতে কী।'

নির্বিরোধ ব্রজ, নির্বিকার তার গলা। তার জীবনের কোথাও প্রতিবাদ নেই, আছে মানিয়ে চলা। সুখবতী চুপ ক'রে থাকে।

বুনো নেয়ে আসতেই ব্রজ বললো, 'হ্যাঁ রে বুনো, কাল তুই মিত্তির ডাক্তারের সঙ্গে ঝগড়া করেছিস্।'

বুনো বললো গা মুছতে মুছতে 'হুঁ, ঝগড়া আবার কি! পরের পেছনে কাটি দেওয়া কেন?'

'কেন, তোকে কী বলেছে?'

বুনো বললো, 'কী আবার। কাল সন্ধ্যেয় কারখানা থেকে আসছি, বাড়ির সামনে চার মণ কয়লা দেখিয়ে বললে, হেই বুনো কয়লাগুলো এট্টুস বাড়িতে তুলে দে তো। যেন আমি ওর বাপের চাকর। বললুম, নিজেরা তুলে লাও না মশাই। তো ডাক্তার বললে আমাকে, তোর তো হারামজাদা খুব তেল হয়েছে। হাঁকাতুম এক ঘুষি। খালি ব'লে দিলুম, আবার যদি হারামজাদা বলো, তোমার ওই মুখ থুবড়ে দোব।'

কথাটা শুনে যেন আঁতকে উঠলো ব্রজ। বুঝি সুখবতীও। ব্রজ বললো,

'তা কয়লাটা তুলে দিলেই হতো। আমাদের বাপ দাদা ও-রকম কত দিয়েছে।'

'দিয়েছে তো দিয়েছে। ও-সব ভদ্দর পীরিত তুই কর্‌গে যা।'

ব্রজ তবু বললে, 'তোর মাপ চাওয়া উচিত।'

'তোর কথায়।' ভেংচে উঠল বুনো। 'গ্যাখ্, বেরজা, মন্তর দিস্‌নে। তোর কাজ তুই কর্।'

মন্তর মানে উপদেশ। ব্রজ তাকে ছেড়ে মাকে ধরলো, 'ডাক্তার বাবু কত কথা বললেন। তা সে একটা মিলের ডাক্তার। আজকেই ফোরম্যানকে ব'লে তোর চাকরি খেয়ে দিতে পারে। গরীবের ছেলেকে কত সইতে হয়।'

এ-সব কথায় বুনোর মাথায় আগুন জ্বলে ওঠে। সে চেঁচিয়ে উঠলো, 'গরীব ব'লে কি মান নেই? এতে যদি চাকরি যায় তো যাক্। তবে তোর ফোরম্যানকেও দেখে লোব। আর তুই যদি ফের আমাকে তাতাবি—'

এবার হামলে পড়ে সুখবতী। চাকরি যাওয়ার কথাটা শুনে, ভয়টাই তার রাগের চেহারায় দেখা দিল, বললো, 'তাতে তোর কি আছে রে ড্যাকরা। তোর জ্বালায় কি আমাদের মরতে হবে? চাইবি, ক্ষ্যামা চাইবি পায়ে প'ড়ে।'

উভয় পক্ষ থেকেই নিরাশ হ'য়ে বুনো তার মেজাজের শেষ সীমায় পৌছুল। চীৎকার ক'রে উঠল, 'তোমাদের দায় থাকে তো তোমরা চাও গে···আর রইল শালার সংসার আর চাকরি আর ভদ্দরের কুটুম্বিতে।'

ব'লে সে দুম দুম ক'রে ঘরে ঢুকে জামাকাপড় প'রে হন্ হন্ ক'রে বেরিয়ে গেল। না খেল রুটি, না চা।

ব্রজ কারখানায় এসে দেখল, বুনো সত্তর ফিট উঁচুতে নতুন চিমনির গায়ে বলটু ঠুকছে।

এই নিয়েই বারোমাস অশান্তি। ব্রজ রোজ এসে বলে, আজ ফোরম্যান এই বলে, কাল কারখানায় এই হয়েছে, বাইরে সেই হয়েছে। আর সুখবতী রাতদিন বুনোকে খিঁচোয়।

বুনো মাথা নোয়ায় না। সে যেন তাদের খালাসীদের শক্তিতে তোলা ওই একশো ফিট উঁচু চিমনিটার মতো সটান ও উদ্ধত। মেঘ ঝড় বৃষ্টিতে সে অবিচল। বলে, 'খাটব—খাব; যেমন আয়নাটি দেখাবে, তেমনি মুখটি দেখবে; কাজ শিখেছি ফিটারের, তুমি বলবে মাইনে বাড়াব না, ফিটারের কাজ কর। কেন? সে হবে না।'

সে হবে না ঠিক, কিন্তু মনের কোথায় যেন খচ্ ক'রে ওঠে। ভাবে, ফোরম্যান শোধ তুলতে পারে। তবু ভাবে, ও যদি শোধ তোলে, আমরা প্রতিশোধ নিতে পারব না?

ব্রজর উন্নতি হয় কাজে। সে সত্যি কেরানির কাজ পায়। তার মান বাড়ে। বাড়ে সুখবতীরও। সে যে বাবু ছেলের মা। এতে বোধ করি বুনোরও একটু গোপন গৌরব-বোধ ছিল, কিন্তু প্রকাশ্যে সে-বোধের অধিকার নেই। নিজের বিবেকের বিরুদ্ধে আপোসহীনতা যেন তার কলঙ্ক। ব্রজ যে তার গৌরবের ভাগ তাকে দিতে রাজী নয়।

এরপর থেকে বুনোকে নিয়ে অশান্তি আরও বাড়ে, ব্রজর দাবী তার চেয়েও বেশী। পাড়া বয়ে লোক শোনাতে আসে ব্রজের কথা। সেই সঙ্গে বুনোর কথাটা বলতে কেউ ভোলে না।

একদিন সেই মাদ্রাজী খ্রীষ্টান মেয়েটি ভাঙ্গা বাংলায় বললে, 'তুমি বড় গোঁয়ার।'

বুনো অমনি হাসি ভুলে মাথা সটান ক'রে দাঁড়ালো। এ-মিথ্যে অপবাদ সে মানতে রাজী নয়। বললে, 'আ ম'লো, গোঁয়ার কোথা দেখলে?'

মেয়েটি বোধ হয় তার প্রেমের অধিকারেই বললো, 'সবাই বলে। তোমার দাদা কেমন ভদ্র, কারুর সঙ্গে—'ব্যস্, বলতে হলো না। ব'লে দিল, 'তা হলে দাদার সঙ্গে পীরিত করলেই পারো।'

ব'লে গামছাটা কোমরে ক'ষে বাঁধতে বাঁধতে সে আপন মনেই বলতে লাগলো, 'রইল শালার পীরিত, নিকুচি ক'রেছে তোর ভালর। এ মেয়ের জন্য শালা আমি রোজ এঁদো পুকুরে ডুবতে আসি!'

সে হন্-হন্ ক'রে চ'লে গেল বড় রাস্তার মিউনিসিপালিটির জলকলের দিকে।

মেয়েটা খানিকক্ষণ অবাক হয়ে তাকিয়ে থেকে তাড়াতাড়ি দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে ধরলো। তার দক্ষিণী টানা চোখে বড় বড় ফোঁটায় জ'মে উঠলো প্রেমের প্রথম অশ্রু।

সারাদিন বুনোর মনটা দমে রইলো কারখানায়। বুকের ভিতরটা কেন যে এ-রকম করছে, সে বুঝলো না। ভেবে পেল না, এ-সংসারে কি ব্যতিক্রমটা সে করেছে।

বিকেলে ব্রজর পিছন পিছন বাড়ি এল।

বাড়ি আসতে না আসতেই মিত্তির ডাক্তার প্রায় আধন্যাংটো হয়ে কোমরে কাপড় গুঁজতে গুঁজতে রুদ্রমূর্তিতে ছুটে এল।

ব্যাপার হয়েছে, তার বাড়ির সামনেই মুখুজ্জেদের দুই পুরুষ আগের একটা ভাঙা ভিটা প'ড়ে আছে। কিছুই নেই, আছে শুধু ইঁট বের-করা গোটা দুই ঘরের দেওয়াল, তাতে ইঁদুর আর সাপের বাস। সেটা মিত্তির কিনেছে। সুখবতীর অপরাধ, সেই দেয়ালে সে ঘুঁটে দিয়েছে, দেয়-ও রোজ। বোধ করি দু' একদিন বারণও করেছে। কিন্তু সুখবতী জানে, প'ড়ো দেয়াল, সে না দিলেও অন্য কেউ দেবেই।

কিন্তু মিত্তির একবারে উগ্র মূর্তিতে চিৎকার করতে করতে ছুটে এল, 'কোথায় সে হারামজাদা ছোটলোক মাগী, তাকে একবার দেখি।'

ভীত সন্ত্রস্ত ব্রজ একেবারে মিত্তিরের পায়ে গিয়ে পড়লো, 'কি হয়েছে কাকাবাবু, আমাকে বলুন।'

বুনো চম্‌কে বন্য বরাহের মতো কাত্‌ হয়ে মিত্তিরের দিকে তাকালো। সুখবতী ভয়ে বিস্ময়ে নির্বাক।

মিত্তির কোনো রকমে তার বক্তব্য ব'লে আবার চেঁচিয়ে উঠলো, 'এত বড় সাহস ছেনাল মাগীর, আমি বারণ ক'রেছি তবু—'

এই অভাবনীয় ব্যাপারে ব্রজ অসহায়ের মতো ব'লে উঠলো, 'এবারটা ছেড়ে দেন, ক্ষমা করেন। মা আমার বুঝতে পারেনি।'

সুখবতী শুধু বললো, 'ভাঙা প'ড়ো দেয়াল বাবু, তাই—'

মিত্তির রুখে উঠলো, 'হাজার ভাঙা হোক, তোর কী? কথায় বলে, ছোটলোক কখনো—'

বুনো আর চুপ ক'রে থাকতে পারলো না। বলে ফেললে, 'ওই ভদ্দর গালাগালগুলোন আর দেবেন না মশাই।'

ব্রজ ব'লে উঠলো, 'বুনো, চুপ!'

কিন্তু মিত্তিরের রাগ চড়লো। সে চেঁচাতে লাগলো, 'কেন দেব না। যার যেমন, তার তেমন। ছেনালকে ছেনালই বলবো।'

ব্রজ দুই হাত জোড় ক'রে বললো, 'আর নয়, কাকাবাবু, আমি মাপ চাইছি এদের হ'য়ে, আমি মাপ চাইছি।'

মিত্তিরের এত রাগের অন্তঃস্রোত ধরা মুশকিল ছিল। সে বুনোর দিকে একবার দেখে যেন জেদ ক'রে ব্রজকেই বললো, 'আমি বলছি, তোর মা—ছেনাল।'

ব্রজ আবার হাত জোড় করার উদ্যোগ করতেই সবাই দেখল, বুনো চকিতে ছুটে এসে ব্রজের হাত দুটো মুচড়ে ধ'রে একেবারে তার পায়ের

কাছে আছড়ে ফেললো। হিসিয়ে উঠলো সে, 'তুই হতে পারিস্ ছেনালের ছেলে, বুনো নয়, বুঝ্‌লি।'

তারপর চোখের পলক না পড়তে সবাই দেখলো, মিত্তিরের সামনের দাঁত দুটো নেই, আর মুখ দিয়ে ভলকে ভলকে তার রক্ত পড়ছে। মৃত্যু-চীৎকার জুড়েছে সে। তার সামনে ক্ষিপ্ত নির্বাক যমদূতের মতো দাঁড়িয়ে বুনো।

তারপর সে এক কাণ্ড। সুখবতীর চিৎকার, বস্তির হট্টোগোল ও হা-হুতাশ, এক এলাহি ব্যাপার।

ঘণ্টাখানেক পরে, ভাঙ্গা আসর থেকে বুনোকে ধরে নিয়ে গেল পুলিস। মামলা পরে, এখন হাজত-বাস তো হোক। সুখবতী যদি পারে, জামিনের যেন চেষ্টা করে।

সুখবতী উঠলো। বুঝলো, বুনোকে ছাড়াতে অক্ষমতা তার কতখানি। তবু ভাঙা গলায় থালি বললো, 'কতদিন, তোকে কতদিন বলেছি।'

বুনো একবার ফিরলো। ব্যাপারটা যেন এখনো তার কাছে পুরো বোধগম্য হয়নি। কেবল বুকের ভিতরটা কেমন করতে লাগলো মায়ের দিকে ফিরে। কথা বললো না, কেবলি বুকটার মধ্যে কী হতে লাগলো, তবু অনুশোচনার কোনো কারণ নিজের মনে সে খুঁজে পেল না।

কেবল সেই মাদ্রাজী মেয়েটি ভাবলো, আমিই ওর মনটা আজ ভেঙে দিয়েছি, তাই। দক্ষিণের সমুদ্রের অথৈ জোয়ার ওর চোখে।

ভোর হবো-হবো। আকাশে আলো দেখা দেবে-দেবে করছে। রাস্তায় আলো নিভে গিয়েছে। নসীরামের বস্তী জাগছে।

ব্রজ জেগেছে। ডান হাতটা তার সত্যি ভেঙে গিয়েছে। সে মাকে ডাকতে গিয়ে থেমে গেল। দেখলো, মা জেগেই আছে। জেগে ব'সে আছে। একলা চুপচাপ।

ব্রজ রোজকার মতো জলের ঘটি নিয়ে এল। পা ছোঁয়াতে গেল মায়ের। হঠাৎ সুখবতী ঘটিটা নিয়ে মেঝেয় ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললো, 'ছেনালের পা ধোয়া জল খাবি, তোর মান যাবে না? তোর লজ্জা করে না? আমি যে ছেনাল।'

ব্রজ অবাক। আশ্চর্য, তার মাও সত্যি ছোটলোক, সেই মালা-ঘরনি বস্তিবাসিনী সুখবতী।

সুখবতী তার রাতজাগা চোখ দুটোতে জল দিয়ে বাইরে এল। গলির মোড়ের দিকে মুখ ক'রে খালি বললো, 'এ সংসারের ধারা বুঝিস্‌নে,... তোকে কতদিন বলেছি, কতদিন...।'

ব্রজ অপ্রতিভ নেংটি ইঁদুরটার মতো অন্ধকার ঘরের মধ্যে চোখ পিট্‌পিট্‌ করতে লাগলো।

কেবল সেই মেয়েটি এঁদো পুকুরের ধারে গিয়ে নির্জন বড় রাস্তাটার দিকে তাকিয়ে রইল। একটু পরেই ওই খালি রাস্তাটাতে কারখানাগামী লোকের আনাগোনা শুরু হবে।

একটু নীল আকাশের খোঁজে

আমাদের এই কল-মিল-গঞ্জ-স্টেশনওয়ালা ঘিঞ্জি ছোট শহরের আকাশ-কটাও এত নীল হয়ে ওঠে মধ্যম ঋতুতে, নানান আকারের সাদা মেঘগুলি নরম গা এলিয়ে এলিয়ে ঘুরে বেড়ায় তার অথৈ বুকে, বর্ষার সদ্যঃস্নাত গাছ-পালাগুলি সবুজ সমারোহে এত মেতে ওঠে, চিলগুলি চিৎকার করে গলা কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে—এমন ডাকে আকাশ থেকে যে, আমাদেরও মনটা ছুটি-ছুটি করে ওঠে।

নানান ভাগে বিভক্ত, কাজ আর কাজঠাসা সময়ের মধ্যে থাবা বাড়িয়ে মুঠোখানেক সময় অপহরণের লোভ কিছুতেই সামলানো যায় না। জানি, আপনি অফিসে বসে বড় সাহেবের সুইং-ডোরটার দিকে একবার তাকাবেন আমার কথা শুনে। তারপর ঠোঁট কুঁচকে একটু হাসবেন। কিংবা যিনি কারখানায় মেশিনের সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছেন, দোকানের হিসেব লিখছেন, তাঁরাও আমার এই মুঠো বাড়িয়ে সময় অপহরণের এ রকম কাব্যিক চৌর্যবৃত্তিকে চার্জশীট এবং ওয়ারণিং, এমন কি ডিসচার্জের বাইনাকুলার দিয়ে কাছাকাছি দেখে, চোখ বড় বড় করে তাকাবেন আমার দিকে। তারপরে জিজ্ঞাসা করবেন, আমি এখনো আমার 'বাপের ভাতে' আছি কি না।

নেই। বিশ্বাস করতে পারেন।

কাজ? তাও করতে হয়। আনেকখানি করতে হয়। আর এমনি একটা কাজ, যেখানে ফাঁকি দিলে কোম্পানি ফাঁকি পড়বে না—সব ফাঁকিটা পড়বে এসে সরাসরি নিজের ঘাড়ে। সেখানে জমার অঙ্কে শূন্য নিয়ে যদিও বা নিজে নিশ্চিন্ত থাকতে পারতুম, কিন্তু কাজটা যেহেতু একেবারে সোজাসুজি দশজনের পাতে গিয়ে পড়ছে, সেই হেতু তৎক্ষণাৎ লোক-জিহ্বা আমাকে সমালোচনার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকে।

কী রকম?

ধরুন, এই-রকম:

ফুলের মালাগাছি বিকাতে আসিয়াছি
পরখ করে সবে, করে না স্নেহ।

যখন ফুল তুলি আর মালা গাঁথি, তখন মনের মতোটি করেই গাঁথি, চেষ্টা করি। কিন্তু সময়টা উনিশশো আটান্ন সাল। জমার অঙ্ক শূন্যে রেখে সত্যিই

তো আর নিশ্চিন্তে মালা গাঁথা যায় না। তাই সে-মালা নিয়ে আপনাদের দোরে আসতেই হয়।

আর আপনিও জানেন, দেখেশুনে না কিনলে ফাঁকিতে পড়তে হবে। আপনি নানান ভাবে পরীক্ষা করেন।

এ যুগে মালা সাজি ভরে রাজসভায় কিংবা অন্তঃপুরে পাঠিয়ে দিলেই কদর হয় না। ওই রাজসভা আর অন্তঃপুর এখন রাজপথে আর জনপদে ঠাঁই নিয়েছে। তাই—

যাক গে, এত কথা বলার প্রয়োজন কী? বলতে চাইছিলুম কাজের কথা। কাজ করি আর তাতে ফাঁকি দিলে মোটেও চলে না। কারণ, কোম্পানি নয়, মালা এখানে মালাকারের নামে বিকোয়। অতএব সাবধান!

তবু সময় চুরির লোভ সামলাতে পারি নে।

ক্ষতি এসে চোখ রাঙায়, কাজ এসে উপদেশ দেয়।

কিন্তু চৌর্যবৃত্তিটা এমন একটি জিনিস যে, বিবেকের শাসনটা আপাতত মানতে রাজী নয়।

কেন? সেইজন্যই বলছিলুম, আমাদের এই ছন্নছাড়া ঘিঞ্জি ছোট শহরটার আকাশটার দিকে একবার দেখুন। সে তার চিমনি আর পুরনো গাছের ডালপালায় যে-ভাবে আকাশটাকে ধরে আছে, সেই আকাশ যেখানে মুক্ত অবাধ হয়ে ছড়িয়ে আছে দূর চক্রবালে, সেখানে যেতে আপনার মন করে কি না, নিজেই একবার পরখ করুন।

না, আমি মোটেই হিল্লি-দিল্লি যাবার কথা চিন্তা করি নি। নিতান্তই, এই শহর থেকে মাইল দশেকের মধ্যেই, কোন একটা নির্জন স্টেশনে গিয়ে নেমে পড়া। তারপরে, আকাশটাকে দেখা।

পারবেন না আসতে? তা হলে আমাকে একা-একাই কাজে ফাঁকি দিতে হয়। দিলুমও। আর মাত্র তিনটা স্টেশন পরেই নেমে পড়লুম।

যা ভেবেছিলুম, তাই। আকাশটাকে কেউ বাঁধতে পারে নি। শরতের মাঠ দিগন্ত ছাড়িয়ে গিয়েছে। আর এই ঘোর দুপুরে, জনহীন স্টেশনটার পাশের বনেই পাখিটা ডাকছে, খোকা কোথা! খোকা কোথা!

মায়ের এই চিরদিনের কান্না শুনতে গেলে, আমার আর মাঠ আর আকাশ দেখা হবে না। তাই পা বাড়ালুম।

কোথায়ই বা পা বাড়াব? ওই তো আবার কোন্ পাখিটা ডেকে উঠছে পুবের মাঠ থেকে। কেহে? কেহে? কেহে?

জবাব দেবার কোন দরকারই নেই জানি। আমাকে নমস্কার করে হেসে বলতেও হবে না, আঁজ্ঞে, আমি অমুক, অমুক জায়গা থেকে এসেছি।

শুধু এই অবাধ মুক্ত আকাশের তলে, চারপাশে সবুজ সমারোহের মাঝখানে দাঁড়িয়ে, এই সব নানান কিচিরমিচির আমাকে শুনতেই হবে। নইলে আকাশটাও এতখানি দেখা যেত না, মাঠও এত অবারিত হতে পারত না।

টিকেট নেবার লোক নেই। প্ল্যাটফরম্ শেষ হয়ে গেল। খানিকটা এগোলেই বাঁ দিকে অনেকগুলি চালাঘর। রেললাইনটা সোজা চলে গিয়েছে উত্তরে টেলিগ্রাফের তারের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে।

চালাঘরগুলির দিকেই পা টানতে লাগল। এই চকচকে অবাধ নীল আকাশটার সঙ্গে নিঝুম চালাঘরগুলির কী একটা সম্পর্ক যেন আছে।

বড় বড় গাছ এখানে সেখানে, তারই নীচে চালাঘরগুলি সারি সারি। ঝাঁপ নেই। বেড়াও নেই। চারিদিকই খোলা। অতএব এগুলিকে ঘর বলা যাবে কি না বুঝতে পারছি নে। মাটি এখনো রীতিমত এবড়ো-খেবড়ো। মানুষ, গোরু আর গোরুর গাড়ির চাকার গভীর দাগ চালাগুলির পাশে। বর্ষার সময়, হাটের দিনে যারা এসেছিল, এ-সব তাদেরই চিহ্ন।

বোঝা গেল এটা বাজার।

খাবারের দোকানে লোক নেই। দোকানদারও ঘুমোচ্ছে। কাচ-লাগানো একটা খাবারের 'কেস্' যদিও আছে, তার কাচ গেছে ভেঙে। কাঠগুলিতে ন্যাতা বুলিয়ে ন্যাতারই রঙ হয়ে গেছে। খাবারও বিশেষ নেই, বোঝাই যায়। মাছিগুলি খালি পাত্রের রসেই যা একটু ভ্যান-ভ্যানাচ্ছে!

শুধু তেলেভাজার কড়াটাই উনুনের উপর চুপড়িঢাকা। সকালবেলা নিশ্চয়ই তেলেভাজার খদ্দের কিছু আসে। নইলে উনুনের তলায় সাতদিনের বাসি ছাই ওগুলি নয় নিশ্চয়ই। আর কুকুরটাও ওভাবে ছাইগাদায় শুয়ে থাকত না, হপ্তাবারে অথবা হাটের দিনেই শুধু আসত হয়তো। একদিনের আশায় কে আর সাতদিন পড়ে থাকে?

খিদে যদি পায় আমার?

ভেবে কোন লাভ নেই। এখানে খাবার খেতে কেউ আসে না।

আর একটা মুদীর দোকান পাশেই। ঝাঁপ হাপ-বন্ধ। নাসিকাধ্বনি শোনা যাচ্ছে মুদীর।

দাওয়ায় বসে আছে একটি লোক। ওর চোখে বোধ হয় ঘুম নেই।

দিব্যি পিলেখানি নিয়ে হলদে চোখে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। পাশে একখানি কাস্তে রয়েছে পড়ে। গামছা দিয়ে মাথাটি বাঁধা। বেশ কষে বাঁধা। বোধহয় মাথা ধরেছে। তার কাছেও একটি কুকুর বসে রয়েছে। সামনে পড়ে থাকা শালপাতাটি চাটা হয়ে গেছে নিশ্চয়।

একটা খোলা চালায় একজন বসে আছে সের পাঁচেক ঢেঁকি-ছাঁটা লাল চাল নিয়ে। পোকা-খাওয়া কিছু বেগুন চটের ওপর বিছানো একজায়গায়। লোক নেই কেউ সামনে।

মনিহারী দোকান আছে একটা। বেড়ায় অনেক ছবিওয়ালা ক্যালেণ্ডার। নানারকমের ছবি। দোকানী বসে বসে কি যেন লিখছে। তাকিয়ে দেখল আমাকে। দেখতেই লাগল। তারপর জিজ্ঞাসা করল, কোথায় যাবেন ?

—বেড়াতে এসেছি।

—ও।

বিরক্ত হল কিংবা বিদ্রূপ করল, বুঝতে পারলুম না। অ-ভক্তিটা টের পাওয়া গেল। আর টের পাওয়া গেল চোখের কোণে একটু সন্দেহ।

কয়েকটি লোক, প্রায় উলঙ্গ, বসে আছে গোল হয়ে। একটা হুঁকো নিয়ে টানাটানি করছে সবাই। সামনে দুটো গরুর গাড়ি, বলদ-হীন, ঘাড় গুঁজে পড়ে আছে। বলদ চারটে একটা গাছের গোড়ায় বাঁধা। লোকগুলির মতই, হাড়সার চেহারা বলদগুলির, অপুষ্ট ঝুঁটিতে জোয়ালের ঘষায় ঘষায় ঘা হয়ে গেছে। কেউ শুয়ে, কেউ বসে। কেউ চোখ বুজে, কেউ অলস চোখে চেয়ে রয়েছে শূন্যে।

আকাশ দেখছে নাকি ?

লোকগুলি কী একটা আলোচনা করছিল। থেমে গিয়ে আমাকে দেখতে লাগল। তারপর চোখাচোখি হ'ল নিজেদের মধ্যে। আবার তাকিয়ে রইল আমার দিকে।

ওদের সকলের চোখই কি হলদে ? একটু নীল আকাশের ছায়াও নেই ?

আর একটু এগোলুম। একটি জীর্ণ সাইকেল, এবড়ো-খেবড়ো মাটিতে ঝন্‌ঝন্ করে এগিয়ে এল সামনে। আরোহীর মাথায় শোলার টুপি, শার্ট কাপড়ের মধ্যে ঢুকানো। গলায় মালার মত স্টেথিস্‌কোপ।

ডাক্তারবাবু। এখানো বাড়ি যাবার সময় পান নি। আমাকে দেখতে লাগলেন ঘন ঘন। তারপর নামলেন একটি ঘরের সামনে। রেডক্রস-আঁকা একটি সাইনবোর্ডও আছে। 'বেলারাণী ফার্মেসী।' ডাঃ হরেন্দ্রকুমার মিশ্র, এল. এম. এফ।

—কোথায় যাবেন ?

—বেড়াতে এসেছি।

—অ! কোত্থেকে আসছেন ?

বললুম জায়গার নাম।

ডাক্তারবাবু বললেন, বেড়ান।

ঘরে ঢুকে গেলেন। চোখ ডলতে ডলতে, বোধহয় কমপাউণ্ডারই হবে লোকটি, বেরিয়ে এল। এসে ডাকল, কই হে, এসো।

সেই গোল-হয়ে-বসা লোকগুলি উঠল।

আমি এগোলুম।

বোধহয় ভুল করেছি। রেললাইনের পুবদিকে গেলেই বোধহয় ভাল হত। ওদিকটায় লোকজন পড়বে ভেবে গেলুম না। মনে করেছিলুম, হাটটা পেরিয়ে গেলেই মাঠ মিলবে। বেশ একটু মেজাজ নিয়ে, একটি গাছতলায় বসব। আকাশটাকে চোখ দিয়ে গিলে গিলে নেশা করব। কিন্তু কী রকম একটা ছন্নছাড়া রিক্ত শ্বাসচাপা চাপা ভাব চারদিকে। কালো কালো গায়ে নখ দিয়ে চুলকানো খড়ি ওঠা খসকা খসকা রঙ যেন সবখানে।

একটু তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে হাটের এলাকাটা পার হতে চাইলুম।

কিন্তু থামতে হল। যেন কাউকে কেউ মারছে, আর কে হাউমাউ করে চিৎকার করছে, এমনি ভাবে শব্দ করছে টিউবওয়েলটা। যে পাম্প করছে, সে একটি বুড়ী। পাম্প করছে কিন্তু জল উঠছে না। এক ফোঁটা জলও দেখা যায় না কলের নীচে, মাটির ওপর। আমাকে বলল একটু টিপে দিতে।

দিলুম। সেই গলা-টিপে-ধরা চিৎকারের মত একটা বিশ্রী শব্দ। কিন্তু একফোঁটা জলও নেই।

বুড়ীটা জিভ ঠোঁট চেটে চলে গেল হাটের দিকে।

আমি এগোলুম। শরতের রোদে বেশ জ্বালা আছে। মাটি থেকেও একটা গরম ভাপ উঠছে। কিন্তু লোকালয় দেখা যাচ্ছে যেন ? লোক নয়, বাড়ি-ঘর দেখা যাচ্ছে যেন। মাটির বেড়া, টালির চাল, টিনের চাল, গোলপাতা কিংবা খড়ের চাল, এ সবই বেশী। পাকা বাড়িও আছে যেন।

কিন্তু মাথার ওপরে এগুলি কী ?

মশা। দুপুরেও দল বেঁধে চক্কোর দিচ্ছে মাথার ওপরে। খেতে চায়। ঘ্যানোর ঘ্যানোর করছে যেন।

তা হলে গ্রাম পড়ে গেল এটা? পার হতে হবে তাড়াতাড়ি।

একটা ভাঙা পুরনো বাড়ির পাশ দিয়ে যাচ্ছিলুম। দেয়ালে ঘুঁটে। দোতলাটা চির-খাওয়া, তার ফাঁকে ফাঁকে বেত-আচড়া সাপের মত কী সব গাছের শিকড়েরা জড়াজাপটি করে আছে।

বাড়িটার দরজা খুলে, একটি মেয়ে দাঁড়াল দরজায়। আর এই মৃত্যু-পুরীর নৈঃশব্দ্যে শোনা গেল, কোথায় যাচ্ছেন?

কাকে জিজ্ঞাসা করছে? পিছন ফিরে দেখলুম, কাকপক্ষীও নেই। ফিরে দেখলুম, মেয়েটি আমার দিকেই তাকিয়ে হাসছে।

—আমাকে বলছেন?

জবাবের আগে, মেয়েটি মুখে আঁচল চাপা দিয়ে হাসল এবং ভিতরের দিকে এমনভাবে তাকাল যে, তার চোখেই একাধিক মানুষের অস্তিত্ব টের পাওয়া গেল। বলল, আর কাকে বলব? আপনি অমুকবাবু, মানে, অমুকদা তো?

মিথ্যে নয়, আমি সেই অমুক। কিন্তু ইনি? হ্যাঁ, 'ইনিই' বলা উচিত। কেননা বয়স কুড়ির নীচে নয় নিশ্চয়ই। অবশ্য দেখতে কেমন, সেটা না বলাই বোধহয় ভাল। কারণ প্রথমটা দেখেই সেটা বোঝা যায় না। তবে চোখ দুটি বড়ই। মুখখানিও কোমল। সিঁথিতে সিঁদুর নেই, অবিবাহিতা, যেটা এখানে অচল। স্বাস্থ্য? মনে হচ্ছে রুগ্ন। আর চোখ, কী আশ্চর্য! এর চোখও হলদে।

আমাকে বলতেই হল, আপনাকে চিনতে পারলুম না তো?

মেয়েটি হাসল। বলল, ভুলে গেলেন? সত্যি, আপনারা ভাবুক বটে। তা তো হবেই। শত হলেও—

একটু অতিমাত্রায় স্মার্ট হবার চেষ্টা পীড়াদায়ক বোধ হল। বোধহয় পরিবেশেরই গুণে। একটু বিব্রত ভাবে হাসতে হয় আমাকে, এবং অপেক্ষাও করতে হয় শেষ পর্যন্ত শোনার জন্যে।

মেয়েটা আবার বলল, সরযূর সঙ্গে আপনাদের বাড়ি গেছলাম, মনে নেই? সেই সরযূ, আপনাদের মিউনিসিপ্যালিটির স্যানিটারি ইনস্পেক্টরের মেয়ে?

ঘাড় নেড়ে স্বীকৃতি জানালুম, সরযূকে আমি জানি।

মেয়েটি বলে আবার, সরযূ আপনার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলে বাড়ি গিয়ে। আমি আমার দিদিরা গেছলুম শহরে সিনেমা দেখতে, সেই সময়। আপনাকে নেমন্তন্ন করেছিলাম আমাদের এখানে আসতে। আপনি

বলেছিলেন, আসবেন। অবিশ্যি আসবেন, সত্যি বিশ্বাস করি নি কোনদিন। শত হলেও আপনারা—

আমাকে বলতে হল, না না, তার কী মানে আছে।

অনেকগুলি গলার ফিসফিসানি আমার কানে এল। দৃষ্টির সীমানাতেও কয়েকটা এলোমেলো চোখ, চিবুকের অংশ, একটু কাঁধ, আঁচলের ঝাপটা দেখা গেল।

মেয়েটি বলল, আসুন। বাইরে দাঁড়িয়ে রইলেন যে।

—হ্যাঁ, চলুন।

হায়রে নীল আকাশ। শরতের নীল আকাশ!

একটা উঠান, ঘাস ভরতি। কুয়ো, কুয়োর বাঁধানো পাড়, শেওলায় যার জন্মকালের কোন তারিখই জানা যায় না। দড়ি বালতি আর এক রাশ এঁটো বাসন ডাঁই করা রয়েছে। দুটো গোরু, খোঁটায় বাঁধা রয়েছে উঠানে।

এবড়ো-খেবড়ো ফাটাফুটি বারান্দা দিয়ে, একটি ঘরে নিয়ে গেল আমাকে মেয়েটি। বাকীরা দুড়দাড় করে দৌড়ে অন্য ঘরে গিয়ে ঢুকল।

যে ঘরে নিয়ে এল, সেটা পুরনো হলেও মোটামুটি পরিষ্কার। দেয়ালে চুনের পোঁচড়া আছে। সিনেমার অভিনেতা-অভিনেত্রীদের ছবি আছে। পারিবারিক ফটোও আছে দু-একটা। খান দুই পুরনো চেয়ার, একটা টেবিল। বইও আছে। সিনেমার পত্রিকা, খানকয়েক সাম্প্রতিক বহুবিক্রীত জনপ্রিয় উপন্যাস, বেশ সযত্নে গুছিয়ে রাখা আছে।

মেয়েটি বললে, বসুন।

বসলুম। মেয়েটি চলে গেল। এবার ভাবনার পালা। অবশ্য, মনে পড়ছে, কবে যেন দেখেছি মেয়েটিকে। আমাদের বাড়িতেই দেখেছি। সরযূই বোধহয় নিয়ে এসেছিল।

কিন্তু এবার কে আসবে? মেয়েটির বাবা? সেইটেই স্বাভাবিক। বাড়ির পুরুষ মানুষ এসে আলাপ করবেন।

অনেকগুলি মেয়ে-গলার হাসি কানে এল। আমার লজ্জা করতে লাগল একলা একলা। কারণ, ওরা জানে আমি ওদেরই খোঁজে এসেছি। যদিও নামটাও মনে নেই।

কিন্তু গায়ে হাতে পায়ে চুলকোচ্ছে কেন?

মশা। বোধহয় অনাস্বাদিত রক্তের গন্ধ পেয়েছে।

আশেপাশে কি লোকজন নেই? এত নিঝুম কেন?

একটু পরেই, দরজার পাশে একটা ছোটখাটো ভিড় দেখা গেল। সকলেই মেয়ে, সকলেই পরস্পরকে ঠেলাঠেলি করছে।

—আহা! চল্ না।

—তুই যা না।

খিলখিল হাসি।

—সেজদি আগে।

—না, বড়দি যাক না।

—আচ্ছা, মা তুমি চলো।

—না না।

—হ্যাঁ।

যিনি প্রথম ঢুকলেন, তিনি ঘোমটায় মুখ-ঢাকা। বাকীরা সকলেই ঘোমটা-বিহীনা। বোধহয় কুমারী, দিদি এবং বোনেরা।

মেয়েটি বলল, ঘোমটা-টানা মহিলাকে দেখিয়ে, আমার মা।

নমস্কার করলুম। তিনি সকলের বেশী জড়সড়। কোনরকমে একবার ঘোমটা খুলে আমাকে দেখলেন। আমিও দেখলুম। বয়স বছর পঞ্চাশ হতে পারে। মেয়েটির মতই মুখ প্রায়। ওঁরও চোখ দুটি বড়, কিন্তু কী আশ্চর্য! ওঁর চোখও হলদে।

উনি কী যেন বললেন মেয়েদের ফিসফিস করে। তারপর আমার দিকে ফিরেও, যেন চুপিচুপিই বললেন, বসুন।

বলতে বলতেও, হেসে মরে গেলেন যেন। আর লজ্জাতেই মিলিয়ে গেলেন বোধহয়।

তারপর পাঁচ বোন। কুড়ির পরে একজন, হয় তো আঠারোর পাড়ে। বাদ বাকী ওপরে। কারুরই বিয়ে হয় নি, বোঝাই যায়। সবাই বসে পড়ল মেঝেতে। পরমুহূর্তেই গায়ে গায়ে পড়ে ভীষণ হাসাহাসি আরম্ভ হয়ে গেল।

আমিও কি হাসব? কি জানি, ঠিক বুঝতে পারছিনে।

—এই বড়দি, কথা বল্ না।

—কী বলব?

—তুই যেন কী জিজ্ঞাসা করবি বলছিলি?

—আমি না, টুকু।

—ও, মেজদি?

—না না। আমি না, তুই তো।

—ভাগ।

নীল আকাশটা আমি দেখতে পাচ্ছিলাম, যে আকাশটাকে এই দরজার পুরনো চৌকাঠের সীমানায় বেঁধে এনেছে।

—জানেন, অমুকদা, বড়দি কবিতা লেখে।

বললুম, তাই নাকি?

বড়দি ধাক্কা দিতে লাগল একজনকে।—এই মিথ্যুক কোথাকার। আমি নয়, জানেন, নমি গল্প লেখে।

নমির কুড়ি বছর। সে মুখে আঁচল চেপে না না করতে লাগল।

যার নাম টুকু, সে জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা, আপনার কোন্ গল্পটা সিনেমা হচ্ছে?

বললুম।

—অমুককুমার থাকবে?

—না।

পাঁচজনের মধ্যেই একটা হতাশা দেখা গেল।

—আচ্ছা কী করে লেখেন?

বোকার মত হেসে বললুম, সেটা ঠিক বলতে পারি নে।

আবার চুপচাপ। পাঁচজনের মিটিমিটি হাসি।

জিজ্ঞাসা করলুম, আপনাদের বাবা—

—বাবা কলকাতায়। চাকরি করেন কলকাতায়, রাত্রে আসবেন।

বললুম, আজকে চলি, কেমন?

একটা প্রবল কলরোল উঠল। না না, ইশ! এখুনি কি? অনেক গাড়ি আছে ফিরে যাবার। একেবারে রাত্রে খেয়েটেয়ে যাবেন।

খেয়ে এবং টেয়ে? সে আবার কী কথা? পাঁচজনের দিকেই ফিরে তাকালুম। আর, পাঁচজনেই সহসা লজ্জায় যেন মাটিতে মিশিয়ে গেল। আর সকলেই আড় চোখে তাকিয়ে দেখতে লাগল।

দশটিই হলদে-চোখ, শীর্ণ-গাল। তবু একটি কোমল করুণ স্নিগ্ধতাও যেন আছে।

কিন্তু আকাশটা আর নীল নেই, ধূসর হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। কেন? শ্বাস ক্রমাগতই আটকে আসছে। আর ভয় নয়, তবুও একটা ভুতুড়ে আবহাওয়া যেন ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে। চারদিকেই কতগুলি অশরীরী আত্মার অস্তিত্ব যেন স্পষ্ট হয়ে উঠছে। কারা তারা?

ঘোমটা জড়িয়ে মা এলেন। থালায় লাল রসগোল্লা (নিশ্চয় সেই দোকানের?) আর এক কাপ চা। পানাপুকুরের জলে দুধ দিলে যে-রকম রঙ হয়, সে রকম চায়ের রঙ।

না না করেও খেতে হল।

—এবার চলি?

পাঁচজনের চোখের দিকে তাকিয়ে যেন থমকে গেলুম। হলদে রঙটা কখন উঠে গেছে, পাঁচজোড়া চোখ, পাঁচজোড়া কালো দীঘির মত শান্ত, নিস্তরঙ্গ, কিন্তু পরিত্যক্ত বিষণ্ণতা সেই কালো জলে। বারে বারে চমকে উঠলুম, কারা এত দীর্ঘশ্বাস ফেলছে আমাকে ঘিরে?

নমি, টুকু, বড়দি, সেজদি, কাউকেই আলাদা করে চিনতে পারছি নে আর।

কে যেন বলল, আবার আসবেন।

—আসব।

আর একজন, আসবেন তো?

—আসব।

মা বললেন, একটা অনুরোধ করব বাবা।

—বলুন।

বললেন, কত জায়গায় তো যান, কত লোকের সঙ্গে আপনার জানা-শোনা। একটু দেখবেন আমার এই মেয়ে ক'টির জন্য। মোটামুটি আনে, নেয়, খায়, এরকম ছেলে হলেই চলবে।

'আচ্ছা' বলতে গিয়েও থেমে গেলুম। ফিরে তাকালুম পাঁচজনের দিকে। পাঁচটি মুখ অবনত। পাঁচজোড়া চোখে, এই অনামী অবাধ মুক্ত নীল আকাশ-গ্রামটার কী এক অবোধ বোবা রহস্যময় কাহিনী যেন চিকচিক করতে লাগল। ঠোঁটের কোণে লেগে রইল একটু অস্পষ্ট হাসি।

বললুম, দেখব।

বেরিয়ে আসবার মুখে, পাঁচজনেই বলল, শহরে ওরা একদিন আসবে ছবি দেখতে, নতুন যে-ছবিটা আসছে।

বাইরে যখন এলুম, আকাশে অন্ধকার নেমেছে প্রায়। মশারা চিৎকার করছে আমাকে ঘিরে। হাটের কাছে এসে মনে হল, এক-আধটা লম্ফ-হ্যারিকেনের আলোয় ভৌতিক ছায়ারা ঘুরছে ফিরছে, কথা বলছে, বোধহয় গুন্‌গুন্‌ও করছে কেউ।

সবটা মিলিয়ে একটা পরিত্যক্ত মৃত-পুরী যেন এই অবাধ-উন্মুক্ত নীল আকাশ গ্রামটা। হায়রে নীল আকাশ!
